MONTHLY VANGUARD

ভ্যানগার্ড

www.spb.org.bd
বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর মুখপত্র
রেজি. নং ডিএ ১৩২৬ : ২০তম বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা
ডিসেম্বর ২০২২; জানুয়ারি ২০২৩
দাম : দশ টাকা

সমাজতন্ত্রই মুক্তির পথ

সুষ্ঠু নির্বাচন নয়, গায়ের জোরে ক্ষমতায় থাকতে ইভিএম কারচুপির পাঁয়তারা করছে সরকার

মহান রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ১০৫তম বার্ষিকী ও বাসদের ৪২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ২৫ নভেম্বর বাসদ নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখার উদ্যোগে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা আহ্বায়ক কমরেড নিখিল দাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জনসভায় বক্তব্য রাখেন বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ, জেলা শাখার সদস্যসচিব আবু নাঈম খান বিপ্লব, সদস্য অসিত বরণ বিশ্বাস, সেলিম মাহমুদ, বেলায়েত হোসেন, এম.এ মিল্টন ও এস এম কাদির।

কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ১০৫তম বার্ষিকী এবং বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদের ৪২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে দেশের শ্রমজীবী মানুষসহ সবাইকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, কেন আমরা রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লববার্ষিকী স্মরণ করছি? কারণ, আমরাও এদেশের বুকে শ্রমজীবী মানুষের রাষ্ট্র তথা শোষণমুক্ত সমাজ, প্রতিষ্ঠা করতে চাই! ১৯১৭ সালের ৭ নভেম্বর বলশেভিক পার্টির নেতা কমরেড লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়ায় শ্রমিকশ্রেণি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করে গঠন করেছিল ইউনিয়ন অফ সোভিয়েত সোশ্যালিস্ট রিপাবলিক। সোভিয়েত সমাজতন্ত্র মানব সভ্যতাকে এক অনন্য উচ্চতায় অধিষ্ঠিত করেছিল। মানুষকে দিয়েছিল সমস্ত রকমের শোষণ-বঞ্চনা ও বন্ধন থেকে মুক্তির স্বাদ। মানব কল্যাণের এমন কোন অভিমুখ ছিল না যেদিকে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা নিত্য নতুন অর্জনের স্বাক্ষর রাখেনি। শ্রমিকশ্রেণি রাশিয়াতেই প্রথম রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে নাই—এর আগে শ্রমিকশ্রেণি ফ্রান্সে ১৮৭১ সালের ১৮ মার্চ রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে প্যারি কমিউন প্রতিষ্ঠা করেছিল। তখন তারা ৭২ দিন রাষ্ট্র ক্ষমতা ধরে রাখতে পেরেছিল। প্যারি কমিউন থেকে শিক্ষা নিয়ে ৪৬ বছর পরে কমরেড লেনিন রাশিয়ায় বিপ্লব সম্পন্ন করেছিলেন। এর মধ্য দিয়ে প্রমাণ হয়েছিল—শ্রমজীবী মানুষ শুধু মাত্র শোষণ-দুঃশাস আর উপেক্ষার শিকার হবে না, শুধু গতর খাটা শ্রমিক হবে না, শুধু কারখানায় উৎপাদনের চাকা ঘুরাবে না—তারা রাষ্ট্র পরিচালনার যোগ্যতাও রাখে।

আমাদের দল বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ ১৯৮০ সালের ৭ নভেম্বর প্রতিষ্ঠা লাভ করে, আমরা প্রতিষ্ঠার ৪২তম বার্ষিকী পালন করছি এবং এই দুটি দিবসকে স্মরণ করে আজকের এই জনসভা।

কমরেড ফিরোজ আরও বলেন, ১৯৮০ সালের ৭ নভেম্বর শ্রমিক-কৃষক, মেহনতি মানুষ ও মধ্যবিত্ত জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চেতনা শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার প্রত্যয় ঘোষণা করে আমাদের পার্টির আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল। ১৯৭১ সালে এদেশের শ্রমিক-কৃষক, ছাত্র-যুবক, নারীসহ সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে নয় মাসের সশস্ত্র লড়াই, ৩০ লাখ মানুষের শহিদি আত্মদান, ২ লাখ মা-বোনের ওপর অমানবিক

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

দুর্নীতির ইঞ্জিন টানছে উন্নয়নের রঙ্গিন বগি নিচে চাপা পড়ছে দরিদ্র খেটে খাওয়া মানুষ

মুক্তবাজারি পুঁজিবাদের উপহার ৫১ বছরের বাংলাদেশ

ডিসেম্বর মাস। আজ থেকে ৫১ বছর আগে এ মাসেই ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর রক্তঝরা জনযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা। একদিকে স্বজন হারানোর শোকসাগর অন্যদিকে আলোর মেলায় উদ্ভাসিত আকাশতলে ধরা কাঁপানো মুক্তির আনন্দে আত্মহারা বিজয়ী জনগণ। কিন্তু বিজয়ের প্রথম প্রহর থেকেই জনতার মুক্তির স্বপ্ন ফ্যাকাশে হতে থাকলো। আপামর জনগণ রক্ত ঢেলে দেশ স্বাধীন করলো আর নেতৃত্বের আসনে থাকা বাঙালি উঠতি ধনিক বুর্জোয়াশ্রেণি করলো দেশ দখল। এখান থেকেই শুরু হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণা, গণ-আকাঙ্ক্ষা ও সাংবিধানিক অঙ্গীকার পাশ কাটিয়ে বা অস্বীকার করে রাষ্ট্র পরিচালনার পথ চলা। মুক্তিযুদ্ধ ছিল সহমর্মিতার, সমস্বার্থের, দশের স্বার্থে-দেশের স্বার্থে নিজেকে উৎসর্গের, অথচ স্বাধীন দেশ চালানোর দায়িত্বপ্রাপ্তদের পথ হলো আত্মপ্রতিষ্ঠার, জোর যার মুল্লুক তার, বৈষম্য সৃষ্টির, দেশকে ব্যক্তি-গোষ্ঠীর স্বার্থে ব্যবহারের। ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছিল, 'বাংলাদেশের জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার নিশ্চিত করনার্থে সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র রূপে প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করিলাম...'। আর স্বাধীনতা পরবর্তী ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বরে প্রণীত সংবিধানের প্রস্তাবনায় লেখা হয়েছে, 'আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে আত্মনিয়োগ ও বীর শহিদদিগকে প্রাণোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল—জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে।' আমরা আরও অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমাদের রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হইবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা—যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হইবে,...'। অনুচ্ছেদ-১০ এ লেখা হয়েছে, 'মানুষের উপর মানুষের শোষণ হইতে মুক্ত ন্যায়ানুগ ও সাম্যবাদী সমাজ লাভ নিশ্চিত

এরপর পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

সভা-সমাবেশ, মিছিলে বাধাদান

নাগরিক অধিকার কোথায়?

৯ ডিসেম্বর '২২ বাম গণতান্ত্রিক জোটের সংবাদ সম্মেলনে সরকার ও পুলিশ কর্তৃক বিরোধী মত দমনের হীনপথ পরিহার করে শান্তিপূর্ণভাবে রাজনৈতিক দলের সভা-সমাবেশ করতে দেয়া; বিএনপি অফিসে হামলা, টিয়ার সেল নিক্ষেপ ও হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত দায়ী পুলিশের বিচার এবং মির্জা ফখরুলসহ গ্রেপ্তারকৃত নেতৃবৃন্দের মুক্তি, নিহতের পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ, আহতদের সুচিকিৎসা প্রদান এবং গণগ্রেপ্তার ও গায়েবি মামলা বন্ধের জোর দাবি জানানো হয়েছে।

সংবাদ সম্মেলন থেকে গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ, সভা-সমাবেশে বাধাদান, হামলা-গায়েবি মামলার প্রতিবাদে এবং ভোট ও ভাতের অধিকার প্রতিষ্ঠায় দেশব্যাপী প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ পালনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।

রাজধানীর পুরানা পল্টনস্থ মুক্তিভবনের মৈত্রী মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন বাম জোটের সমন্বয়ক, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি)'র সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্স। এ সময়

এরপর পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ১

সমাজতন্ত্রই মুক্তির পথ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

নির্যাতন, কোটি কোটি মানুষের প্রতিরোধ সংগ্রাম ও ব্যাপক সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির বিনিময়ে আমাদের এই স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের শুরু হয়েছিল।

স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে দেশের শাসনতন্ত্র—সংবিধান প্রণীত হয়েছে। যার ভিত্তিতে দেশ পরিচালিত হবে। সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার ৪টি মূলনীতি লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং জাতীয়তাবাদ। পাকিস্তান রাষ্ট্র অধিকাংশ সময় পরিচালিত হয়েছিল সামরিক শাসনের মাধ্যমে, তাই প্রত্যাশা ছিল স্বাধীন দেশ হবে জনগণের ক্ষমতায়নের একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। শোষণ-বৈষম্যহীন সাম্য সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সমাজতন্ত্র। পাকিস্তান ছিল একটা ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র, তার বিপরীতে বাংলাদেশ হবে ধর্মনিরপেক্ষ সেক্যুলার রাষ্ট্র ও স্বাধীন জাতীয় বিকাশের অর্থে জাতীয়তাবাদ। পাকিস্তান রাষ্ট্র সিয়াটো-সেন্টো চুক্তিতে যুক্ত হয়ে সাম্রাজ্যবাদের সাথে গাঁটছড়া বেধে পরিচালিত হয়েছিল কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশ কোন সাম্রাজ্যবাদের সাথে গাঁটছড়া বাধবে না, নতজানু হবে না। সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসন, লুণ্ঠন যেখানে আছে তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্র সোচ্চার থাকবে। মানুষ মনুষ্যত্ব নিয়ে মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপন করবে। অন্যায় অবিচার শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে মানুষ যাতে ন্যায় বিচারের অধিকার পায় সেই লক্ষ্যে সামাজিক ন্যায় বিচারের সমাজ প্রতিষ্ঠি হবে। বাংলাদেশের জনগণ জনযুদ্ধে বিজয় লাভ করেছিল, সংবিধানে সেই আকাঙ্ক্ষার স্বীকৃতি দেয়া হয়েছিল ঠিকই কিন্তু সে ধারায় দেশকে পরিচালিত না করে—উঠতি ধনিকশ্রেণির রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে শোষণমূলক ধনবাদী পথে শাসনব্যবস্থা পরিচালিত করে জনগণকে অধিকার বঞ্চিত করে।

তারা রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি গ্রহণ করল—ধনিকশ্রেণিকে তোষণ আর গরিব, শ্রমিক-কৃষক, মেহনতী মানুষকে শোষণ করার। যে কারণে দেখা গেল, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাংলাদেশে কোটিপতির সংখ্যা ছিল মাত্র দুইজন কিন্তু দেশের শাসন ব্যবস্থা যেহেতু শোষণ ও নিপীড়নের পক্ষে, সে কারণে '৭২ সালের ডিসেম্বর মাসে কোটিপতির সংখ্যা পাঁচজনে উন্নীত হলো। ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশে একটা দুর্ভিক্ষ হয়েছিল, সে দুর্ভিক্ষের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে অনেক মানুষ মৃত্যুবরণ করেছিল। আর দুর্ভিক্ষের পর বাংলাদেশের কোটিপতির সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৪৭ জনে।

স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা পর দেশে ভূমিহীন খেতমজুর-দিনমজুরের সংখ্যা না কমে বরং বেড়ে চলল। '৭১ সালে ভূমিহীনের সংখ্যা শতকরা ৪০ জন ছিল আর স্বাধীনতার ৫১ বছর পর এ সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো ৭২ জনে। একদিকে বাড়ছে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা অপরদিকে দিকে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে কোটিপতির সংখ্যা। সে কারণে স্বাধীনতার নয় বছরের মাথায় ১৯৮০ সালে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চেতনার বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা ও শ্রমিক-কৃষক, মেহনতি মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদের আত্মপ্রকাশ ঘোষণা করা হয়েছিল। গত ৪২ বছর ধরে আমরা দেশের গ্রাম-গঞ্জে, উপজেলা-জেলায়, শিল্পাঞ্চলে শ্রমজীবী মানুষের কাছে গিয়েছি এবং তাদের সমস্যা নিয়ে আমাদের শক্তি-সামর্থ্য অনুযায়ী সাধ্যমত আন্দোলন-সংগ্রাম গড়ে তুলেছি। দেশের প্রতিটি গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, সাম্প্রদায়িকতা মৌলবাদ বিরোধী সংগ্রামে যুক্ত ছিলাম। জাতীয় সম্পদ রক্ষার সংগ্রামে আমরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছি। আমরা সকল প্রকার শোষণ-লুণ্ঠন ও দুঃশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করে চলেছি।

তিনি বলেন, নিত্যপণ্যের দাম বৃদ্ধিতে জনজীবন অতিষ্ঠ। চাল-ডাল, আটা, তেল-নুন, চিনিসহ নিত্যপণ্যের দাম লাগামহীনভাবে বাড়ছে এবং তার সাথে পাল্লা দিয়ে দাম বাড়ছে জ্বালানি তেল, গ্যাস-বিদ্যুত, পানিরও। শিক্ষা-চিকিৎসা ব্যয় মিটাতে মানুষ নিঃস্ব হচ্ছে। বাড়িভাড়া-গাড়িভাড়া বাড়ছে। শ্রমজীবী মানুষ জীবন নির্বাহ করতে গিয়ে প্রতিনিয়ত হিমশিম খাচ্ছে। ঘরে ঘরে অভাব-অনটন দারিদ্র্য ও বেকারত্ব বিরাজ করছে। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির (এফএও) এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'বাংলাদেশে পরিবারের খাদ্য কেনার জন্য ৬৪ শতাংশ মানুষ ঋণ নিয়েছে। ২৯ শতাংশ পরিবার তাদের সঞ্চয় ভেঙেছে। খাবার কিনতে গিয়ে ১০ শতাংশ পরিবার তাদের গত ১২ মাসের সঞ্চয় ভেঙে ফেলেছে। মানুষ তাদের খাদ্য তালিকা থেকে মাছ-মাংস, দুধ-ডিম বাদ দিয়েছে। ৩৮ শতাংশ মানুষ খাবার কিনতে না পেরে অপুষ্টিতে ভুগছে। (প্রথম আলো ২৩ নভেম্বর)। এই চিত্রটা আরও পরিষ্কার হয় যখন দেখা যায় ওএমএস এর পণ্য কেনার জন্য শত শত মানুষ সারাদিন ট্রাকের লাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করেও খালি হাতে ফিরে যাচ্ছে।

কমরেড ফিরোজ বলেন, ব্যবসায়ী সিন্ডিকেটের দৌরাত্মে বাজার অস্থিতিশীল। সিন্ডিকেট ব্যবসায়ীদের কাছে মানুষ জিম্মি ও অসহায় হয়ে পড়েছে। সরকার সিন্ডিকেট ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কোন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না। উপরন্তু তাদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দিচ্ছে, পৃষ্ঠপোষকতা করছে। বাণিজ্যমন্ত্রী আক্ষেপ করে বলেছেন, ব্যবসায়ীরা কথা রাখেননি। ব্যবসায়ীরা কোরবানির ঈদের আগে বাজারে সয়াবিন তেলের কৃত্রিম সংকট তৈরি করে সরকারের সিদ্ধান্তের তোয়াক্কা না করেই দাম বাড়িয়ে দিয়েছিল। খাদ্যমন্ত্রী ১ সেপ্টেম্বর ওএমএস উদ্বোধনকালে বলেছেন, বাজারে বিভিন্ন পর্যায়ে ব্যবসায়ীদের মধ্যে সিন্ডিকেট ভাঙা সম্ভব হয় না। একদিকে করোনায় মানুষ চাকরি হারিয়েছে, কাজ হারিয়ে বেকার হয়েছে। মানুষের আয় কমেছে তাই খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ কমাতে বাধ্য হয়েছে। দেশের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, আগামী ২০২৩ সাল দেশে দুর্ভিক্ষ হতে পারে। পরে আবার তা সংশোধন করে বলেছেন, অভাব হবে না কারণ আমাদের তিনবার ফসল হয় আমাদের যে মজুদ আছে তাতে সমস্যা হবে না।

অমর্ত্য সেন ১৯৪৩ সালে ভারতবর্ষের দুর্ভিক্ষসহ অন্যান্য দুর্ভিক্ষকে পর্যবেক্ষণ করে সিদ্ধান্তে আসেন যে, 'খাদ্যের অভাবে পৃথিবীতে কখনও দুর্ভিক্ষ হয়নি, হয়েছে সুষম বণ্টনের অভাবে।' দুর্ভিক্ষের সময়েও দেশে খাদ্য মজুদ পর্যাপ্ত ছিল এবং বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানি করা হয়েছিল। কিন্তু মজুদ থাকলে কী হবে যদি বিলিবণ্টন সুষ্ঠুভাবে না হয় তাহলে অভাব দূর হবে না। মানুষের কাছে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করার যে সরকারি নীতি ও প্রথা সেগুলোর কারণে দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। তিনি বাংলাদেশের ৭৪ সালের দুর্ভিক্ষের ক্ষেত্রেও একই কথা বলেছেন। কাজেই দেশে পর্যাপ্ত খাদ্য উৎপাদন হলেও পুঁজিবাদী-মুক্তবাজারী অর্থনীতির ফলে বিলিবণ্টন সুষ্ঠুভাবে হবে না। বাজার সিন্ডিকেটের কাছেই মানুষ জিম্মি হয়ে থাকবে।

তিনি বলেন, দেশ খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ, অথচ মানুষ খাবার পাচ্ছে না কেন? বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে কয়েক বছর ধরে প্রচার করা হচ্ছে যে, দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। এ কথা ঠিক যে, দেশের কৃষকরা খাদ্য উৎপাদন ধারাবাহিকভাবে বাড়িয়ে চলছে। স্বাধীনতার ৫১ বছরে কৃষকরা গড়ে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়িয়ে চলছে। বর্তমানে খাদ্য উৎপাদন প্রায় চার কোটি টন আর জনসংখ্যা সাড়ে ১৬ কোটি। আবার বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা) এফএও গত সেপ্টেম্বরের খাদ্যশস্য আমদানি প্রতিবেদনে দেখিয়েছে বাংলাদেশ গত অর্থবছরে ১ কোটি ৫ লাখ ৩৩ হাজার টন খাদ্য আমদানি করছে। চলতি বছর আমদানির পরিমাণ ১ কোটি ৪ লাখ ৪৯ হাজার টন হতে পারে। দেশের কৃষি বিভাগ এক তথ্য দেয়, কৃষি মন্ত্রণালয় আরেক তথ্য দেয় কোনোটার সাথে কোনোটার মিল নাই। বাস্তবে জনগণকে গোলক ধাঁধাঁয় ফেলে প্রকৃত সত্য আড়াল করতে একেক বার একেক তথ্য দেয়া হয়। প্রকাশিত পরিসংখ্যানগুলো বলছে দেশে গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি, মাংসের উৎপাদন বেড়েছে, মাছের উৎপাদন বেড়েছে, ফল-শাকসবজির উৎপাদন বেড়েছে এক কথায় সকল ক্ষেত্রে উৎপাদন বেড়েছে। তাহলে প্রশ্ন ৩৮% মানুষ পুষ্টিহীনতায় ভুগছে কেন?

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বলছে দুর্ভিক্ষ হতে পারে, কৃষি মন্ত্রী বলছে বিরোধী দল দুর্ভিক্ষের কথা বলে অপপ্রচার চালাচ্ছে। জনগণকে নাকি ভয় দেখাচ্ছে এবং সরকারকে বিপদে ফেলানোর চেষ্টা করছে। আমরা প্রধানমন্ত্রীর কথা বিশ্বাস করব নাকি কৃষি মন্ত্রীর কথা বিশ্বাস করব? দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হলেও মানুষের অভাব তো দূর হয়নি। তাহলে কেন আজকে মানুষের ঘরে অভাব থাকবে? কেন অর্ধাহারে অনাহারে মানুষ দিন কাটাবে। আমরা তাই বলতে চাই শুধু উৎপাদানের প্রাচুর্য দিয়ে জনগণের অভাব দূর হবে না, অভাব দূর করার জন্য বিলিবণ্টন ব্যবস্থায় পরিবর্তন জরুরি। বিলিবণ্টন ব্যবস্থার মধ্যে যদি সামঞ্জস্য না থাকে সমতা না থাকে, তাহলে অভাব-দারিদ্র্য দূর হবে না, দুর্দশা ঘুচবে না। এ কারণে আমরা বলছি উৎপাদন ও বিলিবণ্টনের মধ্যে একটা ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আর এই শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সেটা সম্ভব নয়। এর জন্য ব্যবস্থার বদল করতে হবে।

কমরেড ফিরোজ বলেন, আমরা দাবি তুলছি শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ২০ হাজার টাকা চাই। বিশ্বের ৯০টি দেশে ন্যূনতম মজুরি আইন করে নির্ধারণ করা হয়। এর মানদণ্ড কী হবে? আমরা বলেছি শ্রম আইনে শ্রমিকদের মজুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রে ১০টি বিষয় বিবেচনার কথা বলা হয়েছে। সে বিষয়গুলোকে ভিত্তি হিসেবে নিতে হবে। আমাদের দেশে ৪ ধরণের মজুরি কাঠামো ও কমিটি আছে। ১. জাতীয় পে-কমিশন; ২. মজুরি কমিশন; ৩. ন্যূনতম মজুরি বোর্ড ও ৪. ওয়েজ বোর্ড। আইএলও ১৩১ নং কনভেনশনে বলা হয়েছে, 'সর্বনিম্ন মজুরি অবশ্যই আইন দ্বারা নিশ্চিত করতে হবে। শ্রমিক ও তার পরিবারের প্রয়োজন, জীবনযাত্রার ব্যয়, সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধা ইত্যাদি বিবেচনায় নিয়ে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করতে হবে। আমাদের সংবিধানে নাগরিকদের যুক্তিসঙ্গত মজুরির বিনিময়ে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তার বিষয়টি রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হিসেবে বলা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট হিসাব করে দেখিয়েছেন দৈনিক ১০ ঘণ্টা কাজ করলে একজন পুরুষ গার্মেন্টস শ্রমিকের দৈনিক ৩ হাজার ৩৬৪ কিলোক্যালোরি এবং নারী শ্রমিকের ২ হাজার ৪০৬ কিলোক্যালোরি এনার্জি লাগে। বিভিন্ন সেক্টরের কাজের ধরন অনুযায়ী এ হিসেবের কিছুটা কমবেশি হবে।

বেসরকারি খাতের শ্রমিকদের মজুরি অবশ্যই সরকারি প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক-কর্মচারীদের প্রাপ্ত আর্থিক মজুরির বেশি হতে হবে। এ বছর ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলারে বলা হয়েছে, ব্যাংক অফিস সহকারী, নিরাপত্তা প্রহরী, পরিচ্ছন্নতাকর্মী এবং মেসেঞ্জাররা ন্যূনতম মজুরি হিসেবে ২৪ হাজার টাকা পাবেন। আমরাও তথ্য-উপাত্ত ও যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছি গার্মেন্টসে ২৪ হাজার টাকার নিচে শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরি হতে পারে না, এর নিচে মজুরি হলে সেটা ন্যায্য হবে না, কোনভাবেই মনুষ্যচিত হবে না। অন্যান্য সেক্টরে ন্যূনতম মজুরি কমপক্ষে ২০ হাজার টাকা নির্ধারণ করতে হবে এবং তা আইন করে বাস্তবায়ন করতে হবে।

প্রবাসী শ্রমিক ও রেমিটেন্স নিয়ে তিনি বলেন, বাংলাদেশের ১ কোটি ২৩ লাখ অভিবাসী নারী-পুরুষ শ্রমজীবী মানুষ পৃথিবীর প্রায় ১৬৯টি দেশে শ্রমশক্তি বিক্রি করছেন। প্রবাসে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন, খাদ্যাভ্যাস ও বৈরী পরিবেশ আর কঠোর পরিশ্রমের ফলে প্রতিদিন প্রায় ১২ জন প্রবাসী শ্রমিক লাশ হয়ে দেশে ফেরত আসে। প্রবাসে শ্রমিকরা চিকিৎসারও সুযোগ পাচ্ছে না। বিদেশে যেতে গিয়ে তারা সাগরে ডুবে মরে, বিভিন্ন দেশের জঙ্গলে গণকবরে বাংলাদেশি শ্রমিকদের লাশ পাওয়া যায়। দূতাবাসসমূহে তাদের যথাযথ সেবা দেয় না। বিমান বন্দরে তাদের নানা ধরনের হয়রানির শিকার হতে হয়। এত কষ্ট স্বীকারের মধ্যদিয়ে তারা আমাদের রিজার্ভ গড়ে তোলে।

রিজার্ভ সংকট, বিদেশে অর্থ পাচার ও সরকারের মিথ্যাচার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, কিছু দিন আগেও সরকার দেশবাসীর সামনে বলেছে দেশে কোন আর্থিক সংকট নাই। গত বছর আগস্ট মাসে বাংলাদেশে সর্বোচ্চ রিজার্ভ ছিল ৪৮ বিলিয়ন ডলার। এর মধ্যে ২২ বিলিয়ন ডলার এসেছে আমাদের প্রবাসী শ্রমিকের আয় থেকে, আর গার্মেন্টস শ্রমিকেরা হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে যে উৎপাদন করে এবং অন্যান্য খাতের রপ্তানি মিলিয়ে ৩৪ বিলিয়ন ডলার এসেছে। আমরা তখন বলেছিলাম সরকার রিজার্ভের মজুদের কথা বলছে তা সঠিক নয়। সরকার তখন আমাদের কথা স্বীকার করেনি, অথচ যখন আইএমএফ, বিশ্ব ব্যাংক, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকসহ সাম্রাজ্যবাদী সংস্থাগুলো এসে বললো সরকারের কাছে রিজার্ভের সঠিক তথ্য নেই এবং রিজার্ভের যে মজুদের কথা বলছে তা সঠিক নয়। তখন তারা সেটা মেনে নেয়। সরকার এটা নিয়ে জনগণের সামনে লুকোচুরি খেলছে। বিভিন্ন ব্যাংক ডলারের অভাবে এলসি খুলছে না। তারা গ্রাহকদের বলছে আপনারা যদি ডলার জোগাড় করে আনতে পারেন তাহলে এলসি খুলতে পারবেন।

এই রকম পরিস্থিতিতে সরকার সাম্রাজ্যবাদী সংস্থা আইএমএফ-এর কাছ থেকে ৪৫০ কোটি ডলার ঋণ নেয়ার জন্য তাদের হাতে-পায়ে ধরছে। আইএমএফ বলছে তোমাদের মজুত রিজার্ভের সঠিক তথ্য আমাদের জানাও। সরকার তা জানাতে পারেনি। তখন আইএমএফ বলছে তোমাদের এখন রিজার্ভ আছে ২৬ বিলিয়ন ডলার যা দিয়ে মাত্র তিন মাসের আমদানি ব্যয় মেটানো যাবে।

এখন তারা আইএমএফ-এর গণবিরোধী শর্তে ঋণ নিচ্ছে। আইএমএফ বলছে, সরকার বেশি ভর্তুকি দেয় বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও কৃষি খাতে। সরকার আইএমএফ-এর শর্ত বাস্তবায়ন করতে ২১ নভেম্বর পাইকারি পর্যায়ে বিদ্যুতের দাম ১৯ দশমিক ৯২ শতাংশ বাড়িয়েছে। এর আগে জ্বালানি তেলের দাম বাড়ানো হয়েছে। করোনার সময় যাতে রেমিটেন্স বেশি আসে তার জন্য ২ শতাংশ প্রণোদনা ঘোষণা করেছিল। আইএমএফ ঐ ২% প্রণোদনা তুলে দিতে বলেছে। গ্লোবাল ফিনান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি বলছে, বাংলাদেশ থেকে প্রতিবছর ৬৪ হাজার কোটি টাকা পাচার হয়ে যায়। তারা টাকা পাচার করে কানাডায় বেগম পাড়া, মালয়েশিয়ায় সেকেন্ড হোম গড়ে তুলছে। পাচার করা টাকা যদি ফিরিয়ে আনা যায় তাহলে আমাদের আইএমএফ-এর কাছ থেকে শর্তযুক্ত ঋণ নিতে হয় না। যারা টাকা-সম্পদ পাচার করেছে, ব্যাংকের টাকা মেরে দিয়ে ঋণ খেলাপি হয়, তারাই আবার নিজেদের দেশপ্রেমিক দাবি করছে।

দেশের অর্থমন্ত্রী সংসদে বলেন, কারা দেশের টাকা নিয়ে যায়, সেই তালিকা আমার কাছে নেই।

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

দুর্নীতি-দুঃশাসন রুখো, অবৈধ সরকার পদত্যাগ কর ও নির্দলীয় তদারকি সরকারের অধীনে নির্বাচন দাও

বাম গণতান্ত্রিক জোট

- নিত্যপণ্যের দাম কমাও, রেশনিং ও ন্যায্যমূল্যের দোকান চালু কর
- পাচারকৃত ও খেলাপি ঋণের টাকা উদ্ধার কর

অবৈধ সরকারের পদত্যাগ, নির্দলীয় তদারকি সরকারের অধীনে নির্বাচন, দুর্নীতি-দুঃশাসন রুখে দাঁড়ানো ও নিত্যপণ্যের দাম কমানো, রেশনিং-ন্যায্যমূল্যের দোকান চালু, পাচারকৃত ও খেলাপি ঋণের টাকা উদ্ধারের দাবিতে ২ ডিসেম্বর বাম গণতান্ত্রিক জোট ঢাকা নগরের উদ্যোগে পুরানা পল্টনে সমাবেশ শেষে গণমিছিল কাকরাইল শান্তিনগর হয়ে মৌচাক মার্কেটের সামনে গিয়ে শেষ হয়।

বাম জোটের ঢাকা মহানগর সমন্বয়ক ডা. সাজেদুল হক রুবেলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, জোটের কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক ও বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্স, বাসদ নেতা খালেকুজ্জামান লিপন, কমিউনিস্ট লীগের নজরুল ইসলাম, বাসদ (মার্ক্সবাদী) 'র ডা. জয়দ্বীপ ভট্টাচার্য, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির শহিদুল ইসলাম সবুজ, সিপিবির জলি তালুকদার ও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের মোদাচ্ছের হোসেন বাবুল প্রমুখ।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, কারসাজি করে ক্ষমতায় থাকার কারণে জনগণের প্রতি কোন দায় নেই, ব্যাংকের গভর্ণর পর্যন্ত ব্যাংক লুট ও খেলাপি ঋণ নিয়ে কথা বলতে বাধ্য হচ্ছেন। নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, দিনের ভোট রাতে করে ক্ষমতায় থাকার কারণে এবং যারা কারচুপিতে ভূমিকা রেখেছে তাদের প্রতি বিশ্বস্থতা দেখাচ্ছে। ব্যাংক ডাকাত-টাকা পাচারকারীদের প্রশ্রয় দিয়ে গরিব কৃষককে সামান্য টাকার জন্য জেলে পুরছে।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, ব্যাংক ডাকাতি-ঋণ খেলাপি-কর ফাঁকির ঘটনা এমন পর্যায়ে চলে গেছে যে, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর বলছেন, 'এক লাখ ডলারের মার্সিডিজ বেঞ্জ গাড়ি মাত্র ২০ হাজার ডলারে আমদানির ঋণপত্র খোলা হয়েছে। বাকি অর্থ হুন্ডিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। আবার আমদানি করা বিভিন্ন পণ্যে ২০ থেকে ২০০ শতাংশ পর্যন্ত ওভার ইনভয়েস (আমদানি মূল্য বাড়িয়ে দেখানো) হয়েছে। নেতৃবৃন্দ এদের তালিকাসহ টাকা পাচারকারী, ঋণ খেলাপিদের তালিকা প্রকাশের দাবি জানান।

নেতৃবৃন্দ তদারকি সরকারের অধীনে নির্বাচন, পাচার হওয়া টাকা ফিরিয়ে আনা, নির্বাচনের আগে সংসদ ভেঙে দেয়া, রেশনিং ন্যায্যমূল্যের দোকান চালু, দ্রব্য মূল্য নিয়ন্ত্রণ, সারা দেশে কৃষকের নামে সার্টিফিকেট মামলা প্রত্যাহার ও সারের দাম কমানোর দাবি জানান।

নেতৃবৃন্দ বলেন, দেশে মানুষের কথা বলার অধিকার নেই, সংবাদ মাধ্যমকে ভীতির ভেতর কাজ করতে হচ্ছে। সব তথ্য আমরা জানছি না, কিন্তু যতটুকু জানছি–ব্যাংকগুলো ইতিমধ্যে ফোকলা হয়ে গেছে। সরকারের কাছের লোকজন প্রভাব খাটিয়ে এক একটি ব্যাংক থেকে শত শত কোটি টাকা অবৈধভাবে ঋণ নিয়ে পাচার করে দিয়েছে। অর্থনীতি চরম বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছে-জননিরাপত্তা নেই, দ্রব্যমূল্য মানুষের জীবনে দুর্বিষহ পরিস্থিতি তৈরি করছে। সবক্ষেত্রে ব্যর্থ সরকার কারসাজি করে আবার ক্ষমতায় বসার ছক কষছে।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, দলীয় সরকারের অধীনে কোন নির্বাচন হলে তাতে মানুষ ভোট দিতে পারবে না। আমরা সেই কারণে নির্বাচনের সময়ে তদারকি সরকার চাই। সংসদ বহাল থাকলে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত হবে না, টাকার খেলা, পেশি শক্তি, কারসাজি, নির্বাচনী প্রচারে ধর্মের ব্যবহার বন্ধ না হলে ভোটের পরিবেশ থাকবে না। সরকার মানুষের কাছে দেয়া কোন প্রতিশ্রুতি রাখেনি। পাহাড়ের জনগণের সাথেও প্রতারণা করেছে। পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন করেনি। আমরা এই চুক্তি বাস্তবায়নের দাবি করছি। এই সরকার গরিবের পেটে লাথি মারছে। কৃষক ফসলের দাম পাচ্ছে না, বেশি দামে সার কিনতে হচ্ছে, আবার সামান্য টাকার জন্য তাকে জেলে নেয়া হচ্ছে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, সরকারের লুটপাটের কারণে বিদ্যুৎ খাতে বিপর্যয় হলেও তার দায় চাপানো হচ্ছে সাধারণ মানুষের উপরে। গণশুনানি ছাড়া গ্যাস বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর অনৈতিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছে সরকার। বামপন্থিদের লড়াই ভোটাধিকারের জন্য, ভাতের জন্য, মজুরির জন্য, মর্যাদার জন্য। আমরা লড়াই করে গ্যাস রপ্তানি ঠেকিয়েছি, বন্দর ইজারা দিতে দেইনি, কয়লা বিক্রি করতে দেইনি। আমরা গণতান্ত্রিক শাসনের দাবিতে রাস্তায় আছি, শোষণ বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আছি। ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠা, দ্বিদলীয় মেরুর বাইরে বিকল্প গড়ার সংগ্রামে আমরা থাকবো। সমাবেশ শেষে একটি গণমিছিল পল্টন বিজয় নগর, শান্তিনগর মালিবাগ হয়ে মৌচাকে গিয়ে শেষ হয়।

উল্লিখিত দাবিতে ২৪ নভেম্বর ফরিদপুর ব্যাংক চত্বর, ২৫ নভেম্বর চট্টগ্রাম জেলা পরিষদ চত্বরে, ২৭ নভেম্বর ময়মনসিংহে কৃষ্ণচূড়া চত্বরে; ২৮ নভেম্বর বগুড়া সাতমাথায়; ২৯ নভেম্বর রংপুর সাত মাথা শহিদ মিনার চত্বরে ৩০ নভেম্বর গাইবান্ধা শহিদ মিনারে সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

বিভিন্ন জেলায় অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাম গণতান্ত্রিক জোটের কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক, সিপিবি কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড রুহিন হোসেন প্রিন্স, বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সহকারী সাধারণ সম্পাদক কমরেড রাজেকুজ্জামান রতন, সম্পাদক জনার্দন দত্ত নান্টু, সিপিবি সহকারী সম্পাদক কমরেড মিহির ঘোষ, শাহিন রহমান, কমরেড মানবেন্দ্র দেব, বীর মুক্তিযোদ্ধা কমরেড শাহাদত হোসেন, বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড আব্দুর রাজ্জাক, কমরেড অ্যাড. সাইফুল ইসলাম পল্টু, সফিউর রহমান শফি, কমরেড নবকুমার কর্মকার, কমরেড আব্দুল কুদ্দুস, বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগের সাধারণ সম্পাদক ইকবাল কবির জাহিদ, সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য অধ্যক্ষ কমরেড আব্দুর সাত্তার, অধ্যাপক জালিলুর রহমান, বাসদ (মার্কসবাদী) কেন্দ্রীয় পরিচালনা পরিষদের সমন্বয়কারী মাসুদ রানা, সদস্য নিলুফা ইয়াসমিন শিল্পী, মাসুদ রেজা, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির কেন্দ্রীয় সদস্য শহীদুল ইসলাম সবুজ।

জেলার নেতা আল কাদেরী জয়, মোশায়েদ হোসেন ঢালী, শফিউদ্দিন কবির আবিদ, অশোক সাহা, রায়হান উদ্দিন, অ্যাড. এমদাদুল হক মিল্লাত, মোখসেদুর রহমান জুয়েল, শেখ বাহার মজুমদার, ইমাম হোসেন খোকন, আজহারুল ইসলাম আজাদ, শেখর রায়, আব্দুল্লাহ আল নকীব, দিলরুবা নূরী, আমিনুল ফরিদ, শাহনেওয়াজ কবির খান পাপ্পু, আনোয়ার হোসেন বাবলু, কাফি সরকার প্রমুখ।

বিশ্বকাপ আয়োজনের নির্মাণ কাজে নিহত-আহত বাংলাদেশি শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ আদায়ের উদ্যোগ নাও

আইএল ও কনভেনশন ১২১, ১৮৯ ও ১৯০ অনুস্বাক্ষর কর

কাতার বিশ্বকাপ আয়োজন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন নির্মাণ কাজে নিয়োজিত ক্ষতিগ্রস্ত বাংলাদেশি নির্মাণ শ্রমিকদের ন্যায্য ক্ষতিপূরণ আদায়ে সরকারের উদ্যোগ গ্রহণের দাবিতে ১৯ নভেম্বর '২২ ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সামনে সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট, ঢাকা নগরের উদ্যোগে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। শ্রমিক ফ্রন্ট ঢাকা নগরের সাধারণ সম্পাদক খালেকুজ্জামান লিপনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আহসান হাবিব বুলবুল, দপ্তর সম্পাদক সৌমিত্র কুমার দাস, মনির হোসেন মলি, আল-আমিন হাওলাদার শ্রাবণ, বাবু হাসান প্রমুখ। সংহতি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরামের সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. দিলরুবা নূরী ও সাংগঠনিক সম্পাদক রোকসানা আফরোজ আশা।

নেতৃবৃন্দ বলেন, এবারের বিশ্বকাপের ঝলমল সাজসজ্জা, নতুন স্টেডিয়াম, চালকবিহীন অত্যাধুনিক মেট্রো ব্যবস্থা, আধুনিক সব যন্ত্রপাতির ব্যবহার বিশ্ববাসী দেখে মুগ্ধ হবে। ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা ফিফার কর্মকর্তারা এবং কাতারের আয়োজকরা এক সুরে বলছেন, বিশ্বকাপের ইতিহাসে এমন বিরাট কর্মকাণ্ড আগে কখনও হয়নি। এই সব কর্মকাণ্ডের জন্য বিভিন্ন দেশ থেকে শ্রমিক নেয়া হয়েছে। তারা দিনরাত প্রচণ্ড গরমে ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস করে নির্মাণের কাজ করেছে।

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

শহিদ ডা. সামছুল আলম খান মিলনের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন

২৭ নভেম্বর স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের শহিদ ডা. সামছুল আলম খান মিলন দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর পক্ষ থেকে সকাল ৮টায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ গেটে মিলনের সমাধিতে এবং সাড়ে ৮টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার সংলগ্ন 'নিঝুম স্থাপত্য মিলনের প্রতিবাদী মুখ' স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পমাল্য অর্পণের মাধ্যমে শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য জুলফিকার আলী, ঢাকা নগর কমিটির সদস্য খালেকুজ্জামান লিপন, মাঈন উদ্দীন চৌধুরী, নাসির উদ্দিন প্রিন্সসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

একই সময়ে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের পক্ষ থেকেও শহিদ মিলনের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়।

উল্লেখ্য, ১৯৯০ সালের এই দিনে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে তৎকালীন সরকারের লেলিয়ে দেওয়া সন্ত্রাসীদের গুলিতে শহিদ হন ডা. সামছুল আলম খান মিলন।

সমাজতন্ত্রই মুক্তির পথ

দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর

পাচারকারীদের নামগুলো আমাদেরকে দেন। গত বছরের ১৮ নভেম্বর পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন এক অনুষ্ঠানে বলেন, বাংলাদেশ থেকে কানাডায় টাকা পাচারের ২৬ জনের কথা তিনি জেনেছেন, এর মধ্যে সরকারি কর্মকর্তরাই বেশি আরও আছে রাজনীতিক ও ব্যবসায়ীরা।

দেশের কৃষক ও কৃষি সম্পর্কে তিনি বলেন, আমাদের কৃষকরা সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত উৎপাদন করে দেশের ১৬ কোটি মানুষের খাবার যোগান দেয় অথচ তারা ফসলের ন্যায্য মূল্য পায় না, সরকারি সহযোগিতা পায় না। সার-বীজ, কীটনাশক-সেচ, বিদ্যুৎসহ কৃষি উপকরণের দাম দফায় দফায় বেড়ে কৃষকের উৎপাদন খরচ বেড়ে যাচ্ছে। তাদের সন্তানেরা লেখাপড়া করতে পারে না, পরিবারে সদস্যদের রোগবালাই হলে চিকিৎসা করাতে পারে না। সারা বছর তাদের কাজ থাকে না। ২০-২৫ হাজার টাকা কৃষি ঋণ পরিশোধ করতে না পারার কারণে ১ লাখ ৬৮ হাজার কৃষকের নামে সার্টিফিকেট মামলা ও হুলিয়া জারি করা হয়েছে। সম্প্রতি ঈশ্বরদীতে ১২ জন কৃষককে ঋণের দায়ে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, অন্যরা পালিয়ে বেড়াচ্ছে। কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপন না করে রাষ্ট্রীয় ২৬টি পাটকল ও ৬টি চিনিকল বন্ধ করে দিয়েছে। কৃষি-গার্মেন্টসসহ দেশের শ্রমিক ও প্রবাসী শ্রমিক–এই তিন খাত আমাদের অর্থনীতির চাকা সচল রাখছে। অথচ এরা সবাই অবহেলার শিকার।

কমরেড ফিরোজ বলেন, শাসকরা দেশের স্বার্থের কথা ভাবে না। শাসকশ্রেণি দেশের অর্থপাচার রোধে যেমন উদাসীন অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদীদের জন্য দেশের সম্পদ লুটপাটের সকল ক্ষেত্র উন্মুক্ত করে দিয়েছে। তারা আমাদের পাচারের টাকা ফেরত আনছে না। গত ৫১ বছর যে সরকারগুলো রাষ্ট্র পরিচালনা করেছে তারা সাম্রাজ্যবাদের কাছে নতজানু থেকেছে। তারা আমাদের পাশের দেশ ভারত থেকে আমাদের ন্যায্য হিস্যা আদায় করতে পারেনি। শাসকরা আমাদের শুনিয়ে আসছে ভারত আমাদের বন্ধু। অথচ তারা বন্ধু রাষ্ট্রের সাথে আন্তর্জাতিক নদীগুলোর পানির সমস্যার সমাধান করতে পারেনি, বাণিজ্য ঘাটতি দূর করতে পারেনি, সীমান্ত হত্যা বন্ধ করতে পারেনি এবং এন্টি ডাম্পিং ট্যাক্স বন্ধ করতে পারেনি।

খেলাপি ঋণ ও ব্যাংক ডাকাতদের সম্পর্কে তিনি বলেন, সরকার যে ধনীদের তোষণ করে সেটা বুঝা যায় ইসলামি ব্যাংক, সোশ্যাল ইসলামি ব্যাংক, ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামি ব্যাংকসহ ৭টি ব্যাংক এক ব্যক্তি সরকারের প্রশ্রয়ে দখল করে নিয়েছেন। সে ব্যাংকগুলো থেকে ১ থেকে ১৭ নভেম্বর পর্যন্ত ২ হাজার ৪০০ কোটি টাকা তুলে নিয়ে ব্যাংকগুলোকে ফোকলা করে দিয়েছে। তারা ইচ্ছা করে খেলাপি হচ্ছে, রি-সিডিউল করে নিচ্ছে। আদালতে মামলা করে তারা খেলাপি হচ্ছে। খেলাপির পরিমাণ দিনে দিনে বাড়ছেই। আওয়ামী লীগের বর্তমান ৩ মেয়াদের শাসনামলে ২০০৯ সাল থেকে ২০২২ সালের অক্টোবর পর্যন্ত খেলাপি ঋণ ২২ হাজার কোটি টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ১ লাখ ৩৪ হাজার কোটি টাকা। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরাও প্রশ্ন করছে তারা কি শুধু দর্শক হয়ে লুট করা দেখবেন? বর্তমান অর্থমন্ত্রী ব্যাংকের অবস্থা কোথায় খারাপ জানতে চেয়েছে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির সাবেক প্রফেসর ড. মইনুল ইসলাম বলেছেন, খেলাপি ঋণ ১ লাখ ৩৪ হাজার কোটি টাকা নয়, বাস্তবে এর পরিমাণ হবে ৪ লাখ কোটি টাকা। অর্থাৎ যেগুলো ইতিপূর্বে অবলোপন করা হয়েছে, যে সব খেলাপি ঋণের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা রয়েছে, এ হিসেবে সেগুলো ধরা হয়নি। ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে ফেরত না দেওয়ার রেওয়াজ আওয়ামী লীগ দাঁড় করিয়েছে। ৫১ বছর পরে কোটিপতির সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় সোয়া লাখে। এভাবে ধনী কোটিপতির সংখ্যা দুর্যোগে, দুর্ভিক্ষে, দুই বছরব্যাপী করনাকালেও বেড়েছে। আয় বৈষম্যে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায় সবচেয়ে বেশি। এক দিকে মানুষ দরিদ্র সীমার নিচে নামছে আর অন্যদিকে কোটিপতির সংখ্যা বেড়ে চলছে। করোনায় সাড়ে তিন কোটি মানুষ দরিদ্র সীমার নিচে নেমে গেছে, আগে ছিল আড়াই কোটি। সব মিলিয়ে ছয় কোটি মানুষ এখন দরিদ্র সীমার নিচে অবস্থান করছে। অপর দিকে করোনার সময় ১৭ হাজার ২২৯ জন নতুন কোটিপতি হয়েছে।

কমরেড ফিরোজ বলেন, শাসকশ্রেণি জনগণের ভোটের অধিকার কেড়ে নিয়েছে। জনগণের প্রতিনিধি নির্বাচনের যে অধিকার 'ভোট' সেটাও শাসক শ্রেণি কেড়ে নিয়েছে। স্বাধীনতার পর দেশে যতগুলো নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে এর কোনটাই অবাধ-সুষ্ঠু হয়নি। সেখানে জনগণের মতামতের প্রতিফলন ঘটেনি। দেশে এ পর্যন্ত ১১টি জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে, এর মধ্যে সাতটি হয়েছে দলীয় সরকারের অধীনে আর চারটি হয়েছে তত্ত্বাবধায়ক সরকার অধীনে। সেই সাতটি নির্বাচনের সবগুলোই প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে, জাল-জালিয়াতিতে ছিল ভরা। আর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে যে চারটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে সেগুলো আপেক্ষিক অর্থে সুষ্ঠু হয়েছে। অর্থাৎ জনগণ তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পেরেছে। ওই চারটিও পরিপূর্ণ মাত্রায় অবাধ সুষ্ঠু হয়নি—ওই নির্বাচনগুলোতেও ছিল কালোটাকার ছড়াছড়ি, পেশিশক্তি প্রদর্শন, সাম্প্রদায়িকতা ও আঞ্চলিকতার অপ-প্রয়োগ। তাই এখানে নির্বাচন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করতে হবে। সংখানুপাতিক নির্বাচন দিতে হবে।

জাতীয় সংসদে 'এলাকাভিত্তিক একক প্রতিনিধিত্বে'র বদলে 'জাতীয়ভিত্তিক সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব' ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে। এই ব্যবস্থায়-জাতীয় সংসদকে প্রধানত জাতীয় নীতি-নির্ধারণ ও আইন প্রণয়ন করার এবং রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় প্রশাসনের কাজকর্ম তদারক করার সংস্থা হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে হবে। স্থানীয় সব উন্নয়নমূলক ও রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক কাজকর্ম সেই এলাকার নির্বাচিত স্বশাসিত স্থানীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত করতে হবে। এর ফলে রাষ্ট্রব্যবস্থার ও প্রসাশনের বিকেন্দ্রীকরণ, স্থানীয় সরকারের প্রকৃত ক্ষমতায়ন এবং রাষ্ট্র শাসনব্যবস্থায় তৃণমূলে জনগণের কার্যকর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হতে পারে।

স্বাধীন বাংলাদেশে দলীয় সরকারের অধীনে প্রথম নির্বাচন হয়েছিল ১৯৭৩ সালের মার্চ মাসে। সেই নির্বাচনে ১৮ থেকে ২০টি আসনে বিরোধী এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরা বিজয়ী হয়ে ছিল কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকার সন্ত্রাস, কারসাজি ও ক্ষমতার স্বেচ্ছাচারী প্রভাব খাটিয়ে তাদের বিজয়ী হতে দেয়নি। জাসদের অন্যতম সহসভাপতি বরিশালের ডা. আজহার উদ্দিনকে মনোনয়পত্র জমা দিতে দেয়নি। গোপালগঞ্জের আওয়ামী লীগের এক প্রার্থীকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পাশ করানোর জন্য প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থী ন্যাপের কমলেশ বেদজ্ঞ ও তার প্রধান প্রচার কর্মী সিপিবি'র জেলা সম্পাদক অলিউর রহমান লেবুসহ ৪ জনকে খুন করা হয়। কুমিল্লার দাউদকান্দিতে জাসদের প্রার্থী আব্দুর রশীদ ইঞ্জিনিয়ারের নিশ্চিত বিজয় ঠেকাতে ভোটের বাক্স হেলিকপ্টারে করে ঢাকায় এনে খন্দকার মোশতাক আহমেদকে জিতিয়ে দেয়া হয়। জাসদ সভাপতি মেজর এম এ জলিলকে হারিয়ে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হরনাথ বাইনকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। টাঙ্গাইলের ড. আলীম আল রাজিকে জালিয়াতি করে হারানো হয়।

১৯৭৩ সাল থেকেই শুরু হয়েছে নির্বাচনে জালিয়াতি। এর পর ২০১৪ সালে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ১৫৩ জন নির্বাচিত হওয়া এবং ২০১৮ সালের নির্বাচনে দিনের ভোট রাতে করে নির্বাচন ব্যবস্থার কফিনে শেষ পেরেক ঠুকে নির্বাসনে পাঠায়। এখন দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন হলে ভোট সুষ্ঠু হবে এবং মানুষ ভোট দিতে পারবে এটা আর কেউ বিশ্বাস করে না। আমরা তাই বলেছি শেখ হাসিনাকে পদত্যাগ করতে হবে, সংসদ ভেঙে দিতে হবে। নির্দলীয় তদারকি সরকারের অধীনে নির্বাচন দিতে হবে। বাংলাদেশের মানুষকে এই দাবিতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

তিনি বলেন, রাজনীতিকে শাসকরা খেলা ও বিনোদনের স্তরে নামিয়ে এনেছে। রাজনীতি হচ্ছে অর্থনীতির ঘনীভূত রূপ। রাজনীতির মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয় তার অর্থনীতি কী হবে, সংস্কৃতি কী হবে। কীভাবে তার শাসন-প্রশাসন পরিচালিত হবে? তার শিক্ষানীতি, শিল্পনীতি-পররাষ্ট্রনীতি কী হবে, কৃষিনীতি-বাণিজ্যনীতি কীভাবে প্রকাশিত হবে ইত্যাদি। মানুষ এগুলো থেকে দলগুলোর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, দৃষ্টিভঙ্গি বুঝবে। প্রত্যেক দল তার নীতি-আদর্শ ঘোষণা করবে, জানাবে—জনগণের জন্য কীকাজ, কী উন্নয়ন-অঙ্গীকার করবে। সেগুলো সমাজে মানুষ চর্চা করবে, আলাপ-আলোচনা, যুক্তি-তর্ক করবে। তারপর যা ভালো মনে হয় তা গ্রহণ করবে। এখন এটা পরিষ্কার এই ধনিকশ্রেণির দলগুলোর নীতি-আদর্শের কোন বালাই নাই। একটাই তাদের লক্ষ্য—ক্ষমতায় যেতে হবে জনগণের সম্পদ, রাষ্ট্রের সম্পদ লুটপাট করতে হবে। সরকারি দলের সাধারণ সম্পাদক এখন প্রতিদিন বলে চলছে—খেলা হবে। রাজনীতি নিয়ে তো খেলা হতে পারে না? এর মধ্য দিয়ে তাদের রাজনৈতিক দেউলিয়াত্ব প্রকাশ পেল। তারা রাজনীতিকে আজকে খেলার পর্যায়ে নিয়ে গেছে কেন? আমরা বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল বাসদের পক্ষ থেকে এবং বামপন্থিদের পক্ষ থেকে বলতে চাই খেলা নয়, লড়াই হবে। পুঁজিবাদী শাসন ও শোষণ উচ্ছেদের লড়াই। শ্রমজীবী জনগণ শোষকদের উৎখাতের মরণপণ লড়াইয়ে রাস্তায় নামবে। শ্রমজীবী মানুষ বুর্জোয়াদের উৎখাত করবে। এই প্রক্রিয়ায় মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত বাংলাদেশ শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হবে।

রুশ বিপ্লব সম্পর্কে কমরেড ফিরোজ বলেন, এ বিপ্লবের পর সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ায় শ্রমিকদের কাজের ঘণ্টা কমিয়েছিল এবং শ্রমিকদের সংগঠন করার অধিকার সুরক্ষিত ছিল, প্রকৃত অর্থেই তারা শিশুশ্রম নিষিদ্ধ করেছিল। আর আমাদের দেশে শ্রমিককে ১২ থেকে ১৬ ঘণ্টা কাজ করতে হয়। আইন থাকলেও আমাদের দেশে ট্রেড ইউনিয়ন করা দুরূহ।

রুশ বিপ্লব শিক্ষা-চিকিৎসা, দর্শন-ইতিহাস, শিল্প-সাহিত্য, চলচ্চিত্র-নাটক খেলাধুলা, বিজ্ঞানসহ জ্ঞান-বিজ্ঞানে ব্যাপক অগ্রগতি ঘটিয়েছিল। সমাজতন্ত্রের শক্তি কত বিশাল সেটা বুঝা যায় ইউরোপের পিছিয়ে পড়া একটা রাষ্ট্র বিপুল সমৃদ্ধি ঘটিয়েছিল। সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নই দুনিয়ায় প্রথম নারীর পূর্ণাঙ্গ ভোটাধিকার নিশ্চিত করেছিল। নারী-পুরুষের বৈষম্য দূর করে নারীর প্রকৃত মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেছিল। বড় বড় কারখানায়, খামারের ম্যানেজার হিসেবে নারীরা নিয়োগ পেয়েছিল, মহাকাশে প্রথম নারী ভেলেন্তিনা তেরেস্কোভাকে পাঠিয়েছিল। ১৯২৯ সালের মহামন্দার সময়েও সেভিয়েত অর্থনীতির সমৃদ্ধি বেড়েই চলছিল। বেকারত্বের অভিশাপ, ভিক্ষাবৃত্তির অপমানজনক লজ্জা থেকে দেশকে মুক্ত করে ১৯৩৭ সালেই কমরেড স্তালিন ঘোষণা করেছিলেন সোভিয়েত রাশিয়ায় কোন বেকার নেই, ভিক্ষুক নেই, পতিতা নেই। এ কথা ঠিক যে, এখন সেখানে সমাজতন্ত্র নেই—এটা একটা সাময়িক বিপর্যয়। নতুন অজানা পথ চলতে গেলে ভুল হয়। এই বিপর্যয়ের কিছু অভ্যন্তরীণ কারণ যেমন আছে আবার বাহ্যিক কারণও আছে। সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের কারণে রুশ বিপ্লবের তাৎপর্য নিঃশেষ হয়নি। তাইতো গোটা পৃথিবীর মানুষ আজ বিস্ময়ে ভাবছে সমাজতন্ত্র মানবজাতিকে কি দিয়েছিল আর সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় মানবজাতি কী সম্পদ হারিয়েছে। একথা আজ বিতর্কের ঊর্ধ্বে যে, সমাজতন্ত্র—পুঁজিবাদ পরবর্তী মানবসভ্যতার একটা উন্নত স্তর। এটা সমাজ বিকাশের অনিবার্য ঐতিহাসিক পরিণতি। সমাজতন্ত্র শ্রেণিবিভক্ত পুঁজিবাদ ও শ্রেণিহীন সাম্যবাদী সমাজের অন্তবর্তীকালীন ধাপ। সমাজতন্ত্র শ্রেণিবিভক্তি সমাজ থেকে যাত্রা শুরু করে শ্রেণি বিলোপের পর্যায় যায়। উৎপাদন, বিলিবণ্টন, শাসন-প্রশাসনের সকল ক্ষেত্রে যৌথ মালিকানা ও যৌথ নেতৃত্বের চর্চায় তা কার্যকরী হয়। ধারাবাহিক বিকাশের মধ্যদিয়ে সমাজতন্ত্র শ্রেণিবিভক্ত সমাজ থেকে শ্রেণিহীন সাম্যবাদে পৌঁছায়। তার কর্মপন্থায় ভুল হলে তা পশ্চাদমুখী হয়ে পড়ে।

আমরা বাসদ বাংলাদেশে শ্রেণিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করছি। পুঁজিবাদের শোষণের অবসানকল্পে দেশে দেশে বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী। আজকে লাতিন আমেরিকার ১৪টা দেশের মধ্যে ১২টা দেশে কোন না কোন রূপে সমাজতান্ত্রিক ধারার বিজয় সূচিত হচ্ছে। দেশে দেশে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন জোরদার হচ্ছে। আমরাও বাংলাদেশে সমাজতন্ত্রের লাল পতাকা উড্ডীন করার সংগ্রামে লিপ্ত আছি। আমরা রুশ বিপ্লব থেকে যেমন শিক্ষা নিব তেমনি তার বিপর্যয় থেকেও শিক্ষা নিব। সেই শিক্ষার আলোকে বাংলাদেশের অর্থনীতি-রাজনীতি, সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়কে বিবেচনায় নিয়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পূর্ণ করার দিকে অগ্রসর হব। আজকে দেশের বুর্জোয়া ব্যবস্থা ভিতর থেকে ক্ষয়ে গেছে, শ্রমিকশ্রেণির ঐক্যবদ্ধ ধাক্কায় তা উৎখাত হবে। আমরা যেমন বেতন বৃদ্ধির আন্দোলন করবো, বকেয়া পাওনার দাবিতে, ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে আশু দাবিতে আন্দোলন-সংগ্রাম করব একইভাবে এই ব্যবস্থার অবসানের চূড়ান্ত লড়াইয়ে দিকে অগ্রসর হব। আমরা মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবিতে, চলমান দুঃশাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করব। আমাদের একক লড়াই যেমন চলবে আবার সকল বামপন্থি শক্তিকে নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে অগ্রসর হব। সমাজ বিকাশের নিয়ম অনুযায়ী সমাজতন্ত্র আসবেই। বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক! মেহনতি মানুষের জয় অনিবার্য।

বিশ্বকাপে ক্ষতিগ্রস্ত বাংলাদেশি শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা নাও

তৃতীয় পৃষ্ঠার পর

ব্রিটিশ পত্রিকা গার্ডিয়ান বলেছে, বিশ্বকাপের ভেন্যু হিসাবে দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকে খেলা শুরুর আগ পর্যন্ত হাজারো ধরনের প্রস্তুতি কাজে মৃত্যুবরণ করেছে ৬ হাজার ৫০০ অভিবাসী শ্রমিক। কোন কোন মানবাধিকার কর্মী বা গণমাধ্যম বলছে এই সংখ্যা ১৫ হাজারের বেশি। গার্ডিয়ানের প্রতিবেদন অনুসারে ২০১১-২০ সাল পর্যন্ত সময়ে বাংলাদেশি মৃত্যুবরণকারী শ্রমিকের সংখ্যা ১০১৮ জন। আইএলও বলছে শুধু ২০২১ সালেই মৃত্যু হয়েছে ৫০ জন অভিবাসী শ্রমিকের। এছাড়াও ৫০০ জন গুরুতরসহ প্রায় ৩৭ হাজার ৬০০ শ্রমিক আহত হয়েছে। উপরন্তু কাতার এই আয়োজনে নিয়োজিত হাজার হাজার শ্রমিকের বেতন এখনও পরিশোধ করেনি। অনলাইনে আইএলও'র কাছে অভিযোগ পড়েছে ৩৪ হাজার ৪২৫টি। অনেক বাংলাদেশি শ্রমিকে ভিসার মেয়াদ পূরণের আগেই জোর করে দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে।

নেতৃবৃন্দ বিশ্বকাপ আয়োজনের নির্মাণ কাজে নিয়োজিত নিহত-আহত ও ক্ষতিগ্রস্ত বাংলাদেশি শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা আদায়ে সরকারকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের আহবান জানান। সরকার কর্মস্থলে ক্ষতিগ্রস্ত হলে ক্ষতিপূরণের, হয়রানি, নির্যাতন সংশ্লিষ্ট আই.এল.ও কনভেনশন ১২১, ১৮৯ ও ১৯০ এখনো অনুস্বাক্ষর করেনি। প্রাবাসী শ্রমিকদের সুরক্ষা দিতে ব্যর্থতার কারণে সংশ্লিষ্ট দেশে বাংলাদেশি দূতাবাসের কর্মকর্তাদের কোনো শাস্তি হয়নি, যা দুঃখজনক। নেতৃবৃন্দ, বিশ্বকাপের আয়োজনে নির্মাণ শ্রমিকদের শ্রম-ঘাম ও জীবনের অবদান ভুলে না যেয়ে তাদের ন্যায্য পাওনা ও ক্ষতিপূরণ অবিলম্বে পরিশোধের জন্য যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণের আহবান জানান।

দুর্নীতির ইঞ্জিন টানছে উন্নয়নের রঙ্গিন বগি; পুঁজিবাদ বাঁচিয়ে রেখে পুঁজিবাদ সৃষ্ট সংকট উত্তোরণের পথ খুঁজছে সরকার

প্রথম পৃষ্ঠার পর

করিবার উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হইবে।' এ সব কিছুই এখন কথার কথায় পরিণত হয়েছে। সাম্যের বদলে বৈষম্য আকাশ ছোঁয়া, বিত্তবান লুটেরাদের মিথ্যা মর্যাদা সত্যিকারের মানবিক মর্যাদাকে গ্রাস করে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে মর্যাদাহীন করে রেখেছে। সামাজিক সুবিচার-ন্যায়বিচার এখন দরিদ্র-শ্রমজীবী এমনকি নিম্নমধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্তদেরও নাগালের বাইরে, বিত্তবৈভবের শিকলে বাঁধা আর ক্ষমতাবানদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার মর্জিতে সাঁটা। তা না হলে কি সাংবাদিক দম্পতি সাগর-রুনি হত্যা মামলার তদন্ত প্রতিবেদন ৯৪ বার পেছাতে পারে? একজন ব্যাংক কর্মকর্তা আরব আলীর বিরুদ্ধে ১৯৮১ সালে মামলা হয়। ৫২ বছর বয়সে আসামী হয়ে ৪০ বছর আদালতে দৌড়াদৌড়ি করে ৯০ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করে মামলা থেকে অব্যাহতি পান (প্রথম আলো ২ ডিসেম্বর ২০২২)।

রাজনৈতিক সহিষ্ণুতা ও মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার ভূলুণ্ঠিত ১০ ডিসেম্বর বিএনপির ঢাকা বিভাগীয় সমাবেশকে কেন্দ্র করে ২ থেকে ৫ ডিসেম্বর ৪ দিনে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ৩ হাজার ৮৯৫ জনকে। ২৪ ঘণ্টায় ৪০৫ মামলা। (প্রথম আলো, ৬ ডিসেম্বর ২০২২)। ৭ তারিখে সমাবেশের তিন দিন আগে বিএনপি কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে পুলিশের নজিরবিহীন নৃশংস হামলা, একজন নিহত–শতাধিক আহত এবং আটক করা হয়েছে প্রায় তিন শ নেতা-কর্মীকে। এর আগে অন্যান্য বিভাগগুলোর সমাবেশেও সড়ক-রেল, নৌপথে পরিবহণ বন্ধ রেখে বিঘ্ন সৃষ্টি করে।

গাজীপুরের কালিয়াকৈর সরকার বিরোধী নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে ২৯ নভেম্বর করা মামলায় ১১ জনের নাম উল্লেখ করে ১৫০ জনকে আসামি করা হয়। একজন গ্রেপ্তারও হয়ে যান। অথচ মামলার বাদি আব্দুল মান্নান শেখ বলেন, 'কসম, আমি ঘটনাস্থলে ছিলাম না। এখানে আলাউদ্দিন এসআই ছিল। এই স্যার আমারে বারে বারে ফোন দিয়া অস্থির কইরা ফেলছে। আমি বলছি স্যার আমি দাওয়াতে আছি। আমি দাওয়াতে থাইক্যা মামলা করলাম কীভাবে? আমি ছিলামও না, দেখিও নাই। স্যারগো আমি কইছিলাম, স্যার আমারে আপনারা ঝামেলায় ফালাইয়েন না।' (প্রথম আলো ১ ডিসেম্বর ২০২২) এরূপ অসংখ্য ঘটনায় আইন ও বিচার-আচারের নমুনা আমরা নিত্যদিন দেখছি।

আর আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি শুধু তিন দিন ২৮, ২৯ ও ৩০ নভেম্বরে পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্য মতে 'ভোলার চরফ্যাশনে এক গৃহবধূকে কোপিয়ে হত্যার অভিযোগ প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে করা হয়েছে। এর কয়েক বছর আগে এসিড নিক্ষেপ করে ঐ নারীর শরীর ঝলসে দেয়া হয়েছিল। বাগেরহাটে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ মামলার এক সাক্ষীকে কোপিয়ে মারার অভিযোগ উঠেছে। সৈয়দপুরে ছাগলে খেত খাওয়ায় হাতাহাতির জেরে এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় এক বৃদ্ধাকে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। শ্রীমঙ্গল চা বাগান থেকে অজ্ঞাত পরিচয় এক ব্যক্তির লাশ মিলেছে। নিখোঁজের প্রায় ৩ মাস পর ফরিদপুরের মধুখালি থেকে এক কিশোরের দেহাবশেষ উদ্ধার করে পুলিশ। ঢাকার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জে এক বাক প্রতিবন্ধীকে ধর্ষণের পর পুড়িয়ে হত্যার অভিযোগ, যাত্রাবাড়ির কাজলা এলাকার একটি বাড়ি থেকে এক দম্পতির লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ, আদালতে সাক্ষ্য দিতে যাওয়ার সময় বগুড়ার ধুনটে আসামির হামলায় এক ব্যক্তি নিহত, চাঁদপুরে বন্ধুর ছুরিকাঘাতে এক কিশোর নিহত, বরিশালে স্বামীকে হত্যার অভিযোগে স্ত্রীকে আটক করে পুলিশ, ঝিনাইদহের মহেশপুরে এক দোকানিকে কোপিয়ে এবং গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে এক ব্যবসায়ীকে জবাই করে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা, সিলেটের কানাইঘাটে ধান খেত থেকে এক যুবকের রক্তাক্ত লাশ উদ্ধার করে পুলিশ (কালের কণ্ঠ ৩০ নভেম্বর ২০২২)। এ ছাড়াও ২০২২ সালের জানুয়ারি থেকে নভেম্বর ১১ মাসে নদী ও সাগর থেকে ৩২৫ লাশ উদ্ধার, পরিচয় মেলেনি ৯২ জনের। হত্যা মামলা ৪৯, অপমৃত্যুর মামলা ১৬২, বুড়িগঙ্গা থেকে উদ্ধার ৪১ লাশ, জেলেদের জালে উঠে আসছে খুলি-কঙ্কাল। (কালের কণ্ঠ ৩০ নভেম্বর ২০২২)

কি ভয়ংকর পরিস্থিতি! নারী নির্যাতন ও নারীর প্রতি সহিংসতার চিত্রও আতঙ্কজনক। আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) তথ্য মতে চলতি বছরে ১০ মাসে ৮৩০ নারী ধর্ষণের শিকার, দলবদ্ধ ধর্ষণ ১৯৫ জন। ধর্ষণের পর হত্যা ৩৯ জন, ধর্ষণ চেষ্টা ১৪১টি, ধর্ষণ ও ধর্ষণ চেষ্টাজনিত কারণে আত্মহত্যা ৭ জন, যৌতুককেন্দ্রিক শারীরিক নির্যাতন ৬৮, নির্যাতন চালিয়ে হত্যা ৭২, এসিড সন্ত্রাস ১২, পারিবারিক নির্যাতন ৪১১। স্বামী ও স্বামীর পরিবারের দ্বারা খুন হয়েছেন ২১৫ জন। পারিবারিক সহিংসতায় আত্মহত্যা করে ৭৯ নারী (কালের কণ্ঠ ২৫ নভেম্বর, ২০২২)।

আর্থিক লুটপাট বেশুমার চলছে। গ্লোবাল ফিনান্সিয়াল ইনটিগ্রিটি (GFI) ২০২০ সালেই তাদের রিপোর্টে বলেছে, 'আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে বাংলাদেশ থেকে প্রতিবছর ৬৪ হাজার কোটি টাকা (৭৫৩ কোটি ৩৭ লাখ ডলার, প্রতি ডলার ৮৫ টাকা হিসাবে) পাচার হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর জানান, ১ লাখ ডলারের মার্সিডিজ বেঞ্জ গাড়ি মাত্র ২০ হাজার ডলারে আমদানির ঋণপত্র খোলা হয়েছে। বাকি অর্থ হুন্ডিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। আবার আমদানি করা বিভিন্ন পণ্যে ২০ থেকে ২০০ শতাংশ পর্যন্ত ওভার ইনভয়েস (আমদানি মূল্য বাড়িয়ে দেখানো) হয়েছে। গত জুলাই মাসে এমন আশ্চর্যজনক প্রায় ১০০টি ঋণপত্র বন্ধ করা হয়েছে।' ২০২১ সালের ডিসেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান গ্লোবাল ফিনান্সিয়াল ইনটিগ্রিটি (জিএফআই) অর্থ পাচার নিয়ে প্রতিবেদনে বলেছে, আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রমের মাধ্যমে মূল্য কমবেশি দেখিয়ে ২০০৯ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত ৪ হাজার ৯৬৫ কোটি ডলার অর্থাৎ ৪ লাখ ২২ হাজার ২৫ কোটি টাকা পাচার হয়েছে। প্রতি বছর গড়ে ৭৫ হাজার কোটি টাকা এভাবে পাচার হয়। তারা আরও বলেছে, বাংলাদেশের সঙ্গে অন্যদের যত আমদানি-রপ্তানি হয়, এর মধ্যে ১৭.৩% পণ্যের ক্ষেত্রে মূল্য ঘোষণায় গরমিল থাকে (প্রথম আলো ২ ডিসেম্বর ২০২২)। ২০১৯ সালে আইএমএফ অবলোপন করা ঋণ বাদে অন্যসব মিলিয়ে খেলাপি ঋণ ২ লাখ ৪০ হাজার কোটি টাকা হিসাব দিয়েছিল। অবলোপন করা ঋণসহ যা দাঁড়ায় প্রায় ৩ লাখ কোটিতে। ২ বছরে তা বেড়ে ৪ লাখ কোটি ছাড়িয়ে যাবে। এর অর্থ হলো ব্যাংক খাতে মোট ঋণের এক তৃতীয়াংশের কাছাকাছি খেলাপি হয়ে গেছে। এর বড় অংশ পাচার হয়ে গেছে (প্রথম আলো ২৫ নভেম্বর ২০২২, অধ্যাপক মইনুল ইসলামের প্রবন্ধ)। ব্যাংকসহ সার্বিক আর্থিক খাতের লুটপাটের ঘটনায় হাইকোর্টে শুনানিতে বিচারপতি বলেন, বেসিক ব্যাংক থেকে যারা জনগণের টাকা আত্মসাৎ করেছেন তাদের আইনের আওতায় আনতে হবে। যারা ব্যাংকের টাকা (জনগণের টাকা) লুটপাট, আত্মসাৎ ও পাচার করেছেন তারা জাতির শত্রু। অর্থ লুটপাট ও আত্মসাতের মামলা দ্রুত ট্রায়াল হওয়া উচিত। যারা জনগণের টাকা আত্মসাৎ করেন, তাদের শুট ডাউনের মতো শাস্তি হওয়া উচিত (প্রথম আলো ৯ নভেম্বর ২০২২)। ইসলামি ব্যাংক থেকে নভেম্বর ২০২২ সালে তুলে নেয়া হয়েছে ২ হাজার ৪৬০ কোটি টাকা। সব মিলিয়ে ৩ কথিত ইসলামি ধারার ব্যাংকের সন্দেহজনক ঋণ ৯ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। শিমুল এন্টারপ্রাইজ ১ হাজার ৬৯০ কোটি, নাবা অ্যাগ্রো ট্রেড ১ হাজার ২২৪ কোটি, আনোয়ারা ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল ১ হাজার ৯০ কোটি, নাবিল গ্রেইন ক্রপস ১ হাজার ১১ কোটি, মার্টস বিজনেস ৯৮১ কোটি, নাবা ফার্ম লিমিটেড ৬৪০ কোটি, ইন্টারন্যাশনাল প্রোডাক্ট প্যালেস ৫৪৫ কোটি, নাবিল ফিড মিলস ৬১ কোটি। ইসলামি ব্যাংক মোট ঋণ প্রায় ৭ হাজার ২৫০ কোটি (১ থেকে ১৭ নভেম্বর ২ হাজার ৪৬০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ)। ফার্স্ট সিকিউরিটি ও এসআইবিএল থেকে এ সময়ে আরও ঋণ ২ হাজার ৩০০ কোটি টাকা।...ব্যাংকের নথিপত্রে নাবিল গ্রেইন ক্রপস লি. অফিসের ঠিকানা বনানীর বি ব্লকের ২৩নং সড়কের ৯ নম্বর বাড়ি। সেখানে গিয়ে দেখা গেল এটি পূর্ণাঙ্গ আবাসিক ভবন। ঋণ পাওয়া মার্টস বিজনেস লি. ঠিকানা বনানীর ডি ব্লকের ১৭নং সড়কের ১৩নং বাড়ি। সেখানে গিয়ে মিললো রাজশাহীর নাবিল গ্রুপের অফিস। মার্টস বিজনেস লাইন নামে তাদের কোন প্রতিষ্ঠান নাই।

এভাবেই ভুয়া কোম্পানি খুলে IBBL থেকে ২ হাজার কোটি টাকা তুলে নিয়েছে (প্রথম আলো ২৪ নভেম্বর ২২)। ২০১৭ সালে ইসলামি ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ নেয় এস আলম গ্রুপ। ২০১৯ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক তদন্তে ব্যাংকটির খাতুনগঞ্জ শাখায় গ্রুপটির ৬ হাজার কোটি টাকার মন্দ ঋণ, ব্যাংকটির বার্ষিক প্রতিবেদনে নিয়মিত হয়ে গেছে। বাংলাদেশ ব্যাংক নিরীক্ষা প্রতিবেদন অনুযায়ী ওই গোষ্ঠী নানা নামে ইসলামি ব্যাংক থেকে ৩০ হাজার কোটি টাকা ঋণ নিয়েছে। দৈনিক নিউ এজ পত্রিকা প্রতিবেদন বলছে, আইন ও নিয়মকানুন মানলে গ্রুপটি ইসলামি ব্যাংক থেকে ঋণ পেতে পারে ২১৫ কোটি টাকা। তার অর্থ পাওয়া যোগ্যতা থেকে ১৩৯ গুণ বেশি আদায় করতে পেরেছে প্রত্যক্ষ-প্রচ্ছন্ন ক্ষমতার প্রভাবে (প্রথম আলো ১ ডিসেম্বর প্রবন্ধে)। অন্যদিকে সাধারণ মানুষের জীবন দ্রব্যমূল্যের কষাঘাতে চরমভাবে বিপর্যস্ত। ৬৪% মানুষ খাদ্য কিনতে গিয়ে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। ২৯% পরিবার তাদের সঞ্চয় ভেঙে চলছে। ১০% পরিবার গত ১ বছরে সব সঞ্চয় ভেঙে খেয়েছে। নিম্ন আয়ের ৪২% পরিবারের শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ সর্বক্ষেত্রে অবনতি হয়েছে। (ঋণ প্রতিবেদন, প্রথম আলো ২৩ নভেম্বর ২০২২)। সরকার খোলা বাজারে (OMS) চাল, ডাল বিক্রির যে ব্যবস্থা করেছে তা এতই অপ্রতুল যে, ১০ থেকে ১৮ ঘণ্টাও অনেক ক্ষেত্রে লাইনে থাকতে হয়। নোয়াখালীর দিনমজুর তপন মালাকার কাজের খোঁজে সস্ত্রীক সীতাকুন্ডে আসে। স্ত্রী শিখা মালাকার (৩৮) ১৪ নভেম্বর ওএমএস এর লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন। ভোরে গিয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে অসুস্থ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে তাকে মৃত ঘোষণা করে (প্রথম আলো ২৩ নভেম্বর ২০২২)। চতুর্দিকে দুর্নীতির ইঞ্জিন টেনে নিয়ে চলছে উন্নয়নের রঙ্গিন বগি আর তার নিচে চাপা পড়ছে দরিদ্র খেটে খাওয়া মানুষ। এটা মুক্ত বাজারি পুঁজিবাদের উপহার, ৫১ বছরের বাংলাদেশ।

এই অবস্থায় আনতে বুর্জোয়া শাসকশ্রেণি রাজনীতিকে আদর্শহীন করে দুর্বৃত্তায়িত করেছে। আর রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুর্বৃত্তদের হাতে তুলে দিয়েছে। গণতন্ত্রের বদলে পরিবারতন্ত্র, লুটপাটতন্ত্র আর স্বৈরতন্ত্রের চেহারা বদল, গদি দখল, পোশাক বদল করতে গিয়ে এরা হানাহানি, খুনোখুনি, চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মদদ, তোষামোদ, গাঁটছড়া বাধা সেরে এখন রাজনীতিকে ভেলকির খেলা বানিয়ে খেলতে নেমেছে। গণতন্ত্র তো দূরের কথা, ভোটতন্ত্রও রক্ষা করার সক্ষমতা এরা হারিয়ে ফেলেছে। নিচের দিকের সকল নির্বাচনে চর দখলের লড়াই আর জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিনা ভোটে কিংবা নিশি ভোটে কাজ সারার জায়গায় পৌঁছেছে। এবার কীভাবে কি হবে তা ঠিক করার জন্য দেশি-বিদেশি মাথাগুলো খাটছে, ঘামছে। পুঁজিবাদকে বাঁচিয়ে রেখে পুঁজিবাদ সৃষ্ট সংকট উত্তরণের পথ খোঁজা হচ্ছে। এর আগে ৩টি বড় সংকটে (১৯৭৫, ১৯৮০-৮১, ২০০৬-৭) যে সব ব্যবস্থাপত্র নেয়া হয়েছিল তাতে এক গোষ্ঠী পুঁজিপতির বদলে আরেক গোষ্ঠী পুঁজিপতি রক্তাক্ত পথে কিংবা চক্রান্ত ষড়যন্ত্রের সিঁড়ি বেয়ে গদিনশীন হয়েছে, তাদের সম্পদ স্ফীত হয়েছে কিন্তু জনদুর্ভোগ কমেনি বিধায় ব্যবস্থা টেকসই হয়নি। হওয়ার কথাও নয়। কারণ, গোষ্ঠী বদল, রং বদল, পোশাক বদল করে একই পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার রক্ষকরাই বহাল থাকছে।

সংস্কারের কথা বলা হচ্ছে কিন্তু কী ধরনের সংস্কার হবে? সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে গণতান্ত্রিক মৌলিক অধিকারসমূহের সম্প্রসারণ ও প্রতিষ্ঠার সংস্কার নাকি সাম্রাজ্যবাদের উপর নির্ভরশীল কিংবা গাঁটছড়া বাধা মুক্তবাজারী পুঁজিবাদী শাসন-শোষণ ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখা ও প্রলম্বিত করার সংস্কার? লুটেরাদের কাছ থেকে লুটপাটের সম্পদ জগণের কাছে ফেরত দেয়ার ও জনকল্যাণ কাজে ব্যবহারের সংস্কার নাকি শ্রমজীবী জনগণের মেধা ও শ্রম শক্তিকে আরও বেশি নিংড়ে নিয়ে অধিক মুনাফা লুটার সংস্কার? জনগণ ৫১ বছরের দেশ শাসন-শোষণকারী শক্তি ও তাদের সহযোগীদের কাছ থেকে ও তাদের কারণে সৃষ্ট বারে বারে ঘুরে আসা সংকট মহাসংকট থেকে পরিত্রাণ চায়। কিন্তু তাদের ঐতিহ্য-বিত্ত, প্রভাব-প্রতিপত্তি, আন্তর্জাতিক মদদ জনমনে পশ্চাদগামী ভাবনা, প্রচারশক্তি, অবনমিত সংস্কৃতি, বামপন্থিদের অনৈক্য-অমনযোগ ও অতীত ভ্রান্তির জের টেনে চলা পরিস্থিতি সব কিছু মিলে ভারী কঠিন পাথর সরানোর কাজটি সাফল্য পায়নি। তবে অর্ধশতাব্দীর আশাহত অভিজ্ঞতা এবার নতুন আশা জাগাতে পারে, তবে পুরোনো কায়দায় নয়। মানুষের বাঁচার ব্যবস্থাকে ওরা দুঃসাধ্য করেছে, অনেক আশার মৃত্যু ঘটিয়েছে কিন্তু মুক্তিযুদ্ধে অর্জিত মুক্তির আকাঙ্ক্ষা-স্বপ্নকে মারা সম্ভব নয়। তাই সমাজের আমূল রূপান্তরের লক্ষ্যে বাম বিপ্লবীদের পাশে দাঁড়ানোর এটাই সময়। এতে আসন্ন সংকট হঠাৎ কাটবে না। কাল বা পরশু এর পূর্ণ সমাধান হয়ে যাবে না। তবে মুক্তির দিগন্তের দেখা মিলবে, উত্তরণ, অতিক্রম ও অর্জনের পথ খুলবে। আসুন সে পথে অগ্রসর হই। মুক্তিযুদ্ধের ৫১ বছরের এটাই বাসদে আহ্বান।

বর্তমান পরিস্থিতির মারমার-কাটকাট, উত্তেজনা ও উষ্কানী সৃষ্টির বাঁচাল বাকযুদ্ধ, অঢেল টাকা ঢালার গড্ডলিকা প্রবাহ, নির্বাচনী কারিকুরি ভাবনা ইত্যাদির মধ্যে ফেঁসে গিয়ে কি অতীতের পুনরাবৃত্তি হতে থাকবে? অতীতে এর চেয়েও খারাপ ছিল এই বিতর্কে খারাপকে বৈধতা দেয়ার রাজনীতি রুখে দাঁড়ানোই এখন সময়ের দাবি। আসুন গণতান্ত্রিক চেতনা রক্ষা, শোষণ-লুণ্ঠন বন্ধ ও জনজীবনের সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে আন্দোলন গড়ে তুড়ি। আওয়াজ তুলুন :

১। ভোটার বর্জিত ও নিশি ভোটের সরকার পদত্যাগ কর, সংসদ ভেঙে দাও, নির্দলীয় তদারকি সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর কর।

২। সংখ্যানুপাতিক নির্বাচন ব্যবস্থা চালু কর। নির্বাচনী আইন সংশোধন করে গণতান্ত্রিক নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন কর। নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণা কর : ক. অনুপার্জিত সম্পদের মালিক ও বিদেশে টাকা পাচারকারী খ. ঋণ খেলাপি ও ঋণ অবলোপনকারী গ. দ্বৈত নাগরিক ঘ. অতীতে নির্বাচনী কাজে জাল-জালিয়াতির সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তি ঙ. সাম্প্রদায়িক ব্যক্তি। সংখ্যালঘুদের সম্পত্তি দখল ও প্রত্যক্ষ পরোক্ষ সাম্প্রদায়িক উসকানিদাতা চ. নারী নির্যাতনে প্রত্যক্ষ পরোক্ষ সম্পৃক্ত ব্যক্তি।

৩। আয়কর যোগ্য ব্যক্তি ও পরিবার ব্যতীত সর্বস্তরে মানুষের জন্য চাল-ডাল, তেল-চিনি,

এরপর পৃষ্ঠা ৯ কলাম ১

মজুরি বোর্ড গঠন করে গার্মেন্টস শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ২৪ হাজার টাকা নির্ধারণের দাবি

গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্ট নারায়ণগঞ্জ

অবিলম্বে মজুরি বোর্ড গঠন করে গার্মেন্টস শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ২৪ হাজার টাকা নির্ধারণের দাবিতে গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্ট নারায়ণগঞ্জ জেলার উদ্যোগে ২ ডিসেম্বর জেলা প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ ও শহরে মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

সংগঠনের জেলা সভাপতি সেলিম মাহমুদের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন শ্রমিক ফ্রন্টের জেলা সভাপতি আবু নাঈম খান বিপ্লব, শ্রমিক নেতা এস এম কাদির, সাইফুল ইসলাম শরীফ, রুহুল আমিন সোহাগ, নূর হোসেন সর্দার, আনোয়ার হোসেন খান, খোরশেদ আলম, মো. সোহেল।

নেতৃবৃন্দ বলেন, গার্মেন্টস বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের প্রধান উৎস। প্রতি বছর গার্মেন্টসের রপ্তানি আয় বাড়ছে। বাংলাদেশের মোট রপ্তানির ৮৩ শতাংশের বেশি আসে গার্মেন্টস খাত থেকে। সাড়ে তিন হাজার কারখানায় ৪০ লাখ শ্রমিকের শ্রমে-ঘামে পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানি থেকে আয় হচ্ছে। ইতিমধ্যে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তর গার্মেন্টস রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে বাংলাদেশ তার অবস্থান দাড় করিয়েছে। অথচ আমরা দেখছি সেই গার্মেন্টসের শ্রমিকদের মজুরি পৃথিবীর মধ্যে সর্বনিম্ন। জীবনযাপনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যয় বেড়ে আকাশ ছুয়েছে। বেড়েছে বাড়িভাড়া-গাড়িভাড়া, শিক্ষা-চিকিৎসা খরচ। দফায় দফায় বাড়ছে গ্যাস-বিদ্যুৎ ও পানির দাম। শ্রমিকের আয় না বাড়ায় তাদের জীবনমান বাড়ছে না। নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত বাংলাদেশে শ্রমিকরা মানসম্পন্ন জীবনযাপন করার মতো মজুরি পাবে না এটা হতে পারে না। আবার অর্থনীতির সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী শ্রমিকের ক্রয়ক্ষমতা বাড়লে দেশের অর্থনীতির সামগ্রিক গতিশীলতা বাড়ে। এ কারণেই প্রতিটি উন্নত দেশের শ্রমিকদের শিক্ষা-স্বাস্থ্যের মান উন্নত। মানসম্পন্ন মজুরি যেমন শ্রমিকদের জীবন মান উন্নত করে তেমনি দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করে। বাংলাদেশকে যদি উন্নত দেশের কাতারে উন্নীত করতে হয় তাহলে শ্রমজীবী মানুষের মজুরি বাড়াতেই হবে। ন্যায্য মজুরির নির্ধারণ তাই বাংলাদেশের শ্রমিক এবং অর্থনীতির বিকাশের জন্যই প্রয়োজন।

নেতৃবৃন্দ বলেন, শ্রমিকের অধিকার ও মর্যাদাপূর্ণ জীবনমান বিবেচনায় গার্মেন্টস শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি কমপক্ষে ২৪ হাজার টাকা হওয়া উচিত। বর্তমান বাজারদরের বিবেচনায় সিপিডিসহ বিভিন্ন গবেষণা সংস্থার গবেষণা এবং বাংলাদেশ ব্যাংক যে সার্কুলার জারি করেছে সবচেয়ে কম মজুরি ২৪ হাজার টাকা নির্ধারণ, বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ৩০০৭ ডলার ইত্যাদি বিবেচনায় নিয়ে গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্ট মনে করে গার্মেন্টসে ২৪ হাজার টাকার কম মজুরি হওয়ার কোন কারণ নেই। সেই বিবেচনায় গার্মেন্টসে পিসরেট শ্রমিকদের রেট দ্বিগুণ হওয়া প্রয়োজন।

নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে মজুরি বোর্ড গঠন করে গার্মেন্টস শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ২৪ হাজার টাকা নির্ধারণ, পিসরেট শ্রমিকদের রেট দ্বিগুণ করা, রেশন ব্যবস্থা চালু, আবাস ব্যবস্থা নিশ্চিত করা, কর্মস্থলে নিরাপত্তা এবং ফকির ফ্যাশন লি. এর শ্রমিকদের নামে দায়ের করা মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানান এবং মজুরির বৃদ্ধির দাবিতে শ্রমিকদের তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

বিএনপি কার্যালয়ে পুলিশী হামলা, গুলিবর্ষণ ও হতাহতের ঘটনার তীব্র নিন্দা

এই হামলা, নেতাকর্মীদের গ্রেপ্তার রাজনৈতিক সংঘাতকে আরও বাড়িয়ে তুলবে

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ সংবাদপত্রে দেয়া এক বিবৃতিতে ৭ ডিসেম্বর ২০২২ নয়াপল্টনে বিএনপি কার্যালয়ে পুলিশ হামলা, গুলিবর্ষণ এবং হতাহতের ঘটনার এবং নেতাকর্মীদের গ্রেপ্তারের তীব্র নিন্দা জানিয়ে অবিলম্বে নেতৃবৃন্দের মুক্তি ও দায়ী পুলিশের শাস্তি এবং নিহত আহতদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ও সুচিকিৎসার দাবি জানান।

বিবৃতিতে তিনি বলেন, রাজনৈতিক দলের সভা-সমাবেশ, মিছিল করার অধিকার দেশের সংবিধান দ্বারা সংরক্ষিত। কিন্তু শাসক সরকার জনগণের সকল সাংবিধানিক অধিকার হরণ করে দেশকে পুলিশি রাষ্ট্রে পরিণত করেছে। সভা-সমাবেশ করার জন্য পুলিশের অনুমতি নেয়ার অলিখিত বিধান কার্যকর করেছে। সম্প্রতি বিরোধী দল বিএনপির বিভাগীয় সমাবেশগুলো পণ্ড করতে বাস-ট্রাক, লঞ্চ, থ্রি হুইলার বন্ধ করে শুধু বিএনপির সমাবেশেই প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেনি, সাধারণ জনগণের চলাচলেও বাধা তৈরি করে অসুস্থ রোগীকে হাসপাতালে নেয়া, শিক্ষার্থীদের স্কুল-কলেজে যাওয়ায় বাধা সৃষ্টি করেছে। বাস্তবে ঐসব এলাকার জনগণকে জিম্মি করে রেখেছিল।

বিবৃতিতে কমরেড ফিরোজ বলেন, ১০ তারিখের বিএনপির ঢাকা সমাবেশকে কেন্দ্র করে জনসভার স্থান নিয়ে সরকার ও বিএনপি বাকযুদ্ধে লিপ্ত হয়ে জনগণের দৃষ্টি এই দিকে আবদ্ধ করে দেশের সম্পদ লুণ্ঠন, ব্যাংক ডাকাতি, অর্থপাচার, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিসহ জনজীবনের সংকট নিরসনে সরকার তার ব্যর্থতা ঢাকার অপচেষ্টা করছে।

বিবৃতিতে তিনি বলেন, ১০ তারিখের সমাবেশকে ঘিরে গণগ্রেপ্তার ও গায়েবি মামলা দায়েরে জনমনে চরম উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা বিরাজ করছে। এহেন পরিস্থিতিতে নয়া পল্টনে বিএনপি কার্যালয়ে হামলা, গুলি করে হত্যা করে রাজনৈতিক পরিস্থিতি যেমন আরও সংঘাতময় করে তুললো তেমনি সরকার তার ফ্যাসিবাদী চরিত্রকে আরেকবার উন্মোচন করলো।

বিবৃতিতে তিনি ২০১৪, ২০১৮ সালের নির্বাচনে নজিরবিহীন জালিয়াতি ও ভোট ডাকাতির দৃষ্টান্ত সৃষ্টিকারী শেখ হাসিনার সরকারকে অবিলম্বে পদত্যাগ করে, সংসদ ভেঙে দিয়ে নির্দলীয় তদারকি সরকারের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচনের দাবি জানান। একই সাথে আওয়ামী ফ্যাসিবাদী সরকারকে উৎখাত করে জনগণের ভোট ও ভাতের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সকল বাম-গণতান্ত্রিক শক্তি ও ব্যক্তিকে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

১৭ ডিসেম্বর '২২ সেগুনবাগিচাস্থ ভ্যানগার্ড মিলনায়তনে জার্মানির এমএলপিডি নেতৃবৃন্দের সাথে প্রগতিশীল নারী নেতৃবৃন্দের মতবিনিময়

এমএলপিডি ও বাসদ নেতৃবৃন্দের দ্বিপক্ষীয় মতবিনিময়

১৮ ডিসেম্বর '২২ এমএলপিডি (মার্কসিস্ট-লেনিনিস্ট পার্টি অব জার্মানি) নেতৃবৃন্দের সাথে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ নেতৃবৃন্দের দ্বিপক্ষীয় মতবিনিময় অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন এমএলপিডি নেতা ও আইকর এর কো-চেয়ার মনিকা গার্টনার এঙ্গেল, ইর্মেলা স্পেক্ট, জন স্পেক্ট এবং বাসদের উপদেষ্টা কমরেড খালেকুজ্জামান, সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ, কেন্দ্রীয় ও আর্ন্তজাতিক প্যানেলের নেতৃবৃন্দ।

১৮ ডিসেম্বর ২০২২ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিউট মিলনায়তনে 'ইউক্রেন যুদ্ধ ও সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থার সংকট' শীর্ষক আন্তর্জাতিক সেমিনারে বক্তব্য রাখেন এমএলপিডি নেতা ও আইকর এর কো-চেয়ারম্যান মনিকা গার্টনার এঙ্গেল, আরও বক্তব্য রাখেন বাসদ সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ

ভর্তুকি আর ক্যাপাসিটি চার্জের পাটিগণিত

দশম বারের মতো বাড়ানো হলো বিদ্যুতের দাম

রাষ্ট্র ক্ষমতায় কোন রাজনৈতিক দল আছে মানেই সেই রাজনৈতিক দলের চিন্তা-দর্শন এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী দেশ পরিচালিত হচ্ছে। ধনিকশ্রেণির দল ক্ষমতায় থাকলে ধনীদের স্বার্থ রক্ষা করবে, যুক্তি মানলে এটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু ধনীদের দল যখন ধনী ও মধ্যবিত্তের বন্ধু বলে দাবি করে এবং গরিব ও মধ্যবিত্তরা তাকে সমর্থন করে তখনই দেখা দেয় বিপত্তি। জনগণের কথা বলেই তাদের উপর লোকসান এবং মূল্যবৃদ্ধির বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর ৯ বার বিদ্যুতের দাম বাড়িয়েছিল। এই সময়কালে পাইকারি পর্যায়ে ১১৮ শতাংশ এবং গ্রাহক পর্যায়ে ৯০ শতাংশ দাম বৃদ্ধি করা হয়েছে। এমনিতেই দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি জনজীবনের স্বস্তি কেড়ে নিয়েছে। চাল-আটা, ডাল-তেল, চিনি তো বটেই এসব দ্বারা তৈরি বিস্কুট-চানাচুর, মিষ্টি-কেক সবকিছুর দাম বেড়েছে অস্বাভাবিক হারে। খাদ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধিতে পাশের দেশসমূহের তুলনায় বাংলাদেশ যে সবচেয়ে এগিয়ে নানা জরিপে তা বলা হচ্ছে। যাদের এসব দেখার কথা, তারা কখনো করোনা, কখনো রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, আর সর্বশেষ বিশ্ববাজারে মূল্যবৃদ্ধির অজুহাতে দায়িত্ব এড়িয়ে যাচ্ছেন। ফলে দাম বাড়ছে এবং মানুষ অসহায়ের মতো তা মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছেন। আয় বাড়ানোর পথ বেশির ভাগ মানুষের জন্য খোলা নেই। তাই তারা খরচ কমানোর পথ খুঁজছেন প্রতিনিয়ত।

এই পরিস্থিতিতে আবার বিদ্যুতের দাম বাড়ানো হলো। কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে, জনগণকে বিদ্যুৎ দিতে গিয়ে সরকার লোকসান করছে। লোকসানের কারণে বিদ্যুতের জন্য সরকারকে ভর্তুকি দিতে হচ্ছে। কত দিন আর ভর্তুকি দেবে সরকার? তাই ভর্তুকির ভার কমাতে পাইকারিতে বিদ্যুতের দাম ১৯ দশমিক ৯২ শতাংশ বাড়িয়ে দিয়েছে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের (বিইআরসি) মাধ্যমে সরকার। মূল্যবৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থাগুলোর কাছে বিক্রি করবে ৬ টাকা ২০ পয়সা, যা আগে ৫ টাকা ১৭ পয়সা ছিল। বলা হয়েছিল খুচরা গ্রাহকপর্যায়ে আপাতত দাম বাড়ানো হবে না এবং গ্রাহকদের ওপর মূল্যবৃদ্ধির কোনো প্রভাব পড়বে না। কিন্তু দাম বাড়ানোর ক্ষেত্রে তর সইলো না, ইতিমধ্যেই গ্রাহকপর্যায়ে ২০ শতাংশ মূল্যবৃদ্ধি করা হলো।

বিইআরসি চেয়ারম্যান ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলন করে বলেছিলেন, '১৭ হাজার কোটি টাকা ভর্তুকির কথা' বিবেচনা করে বিদ্যুতের বাল্ক মূল্যহার পুনর্নির্ধারণের এই সিদ্ধান্ত তারা নিয়েছেন। ডিসেম্বর মাসের বিল থেকে এই নতুন মূল্যহার কার্যকর হবে। বিদ্যুতের মূল্য প্রতি ইউনিট ১ টাকা ৩ পয়সা বৃদ্ধির ফলে কত আয় বাড়বে বা কতখানি ভর্তুকি কমবে সে হিসাবও তারা দিয়েছেন।

কমিশন হিসাব করে দেখিয়েছে, নতুন মূল্য কার্যকর হওয়ার ফলে পিডিবির আয় বছরে আট হাজার কোটি টাকা বাড়বে। কিন্তু তার পরও ভর্তুকি দিতে হবে। এবং তাদের হিসাব অনুযায়ী ইউনিট প্রতি দাম বাড়িয়ে ৮ টাকা ২৮ পয়সা করলে পিডিবি পুরো ১৭ হাজার কোটি টাকার ভর্তুকি থেকে হয়তো মুক্ত হতে পারত। প্রশ্ন আসতে পারে তাহলে কী হতো? লোকসানের অজুহাত দেয়া কি বন্ধ হতো? গত এক যুগ তো বটেই তারও আগে থেকে মানুষ শুনে আসছেন লোকসান হচ্ছে এবং ভর্তুকির ভার আর সহ্য করা যাচ্ছে না। দাম বাড়াও ভর্তুকি থেকে বিদ্যুৎ খাতকে রেহাই দাও। কিন্তু ইতিহাস বলে দাম বাড়ানো হয় বারবার অথচ লোকসানের কবল থেকে বাঁচে না বিদ্যুৎ খাত। তাহলে খুঁজে দেখা দরকার সমস্যাটা কোথায়? আর গণশুনানির নামে প্রহসন করে বার বার দাম বাড়ানো সহজ সমাধান হলেও কার্যকর সমাধান কী?

এবারের দাম বাড়ানোর পর বিবেচনা করে দেখা যাক, দাম বাড়বে কীভাবে, কোথায় এবং কতটুকু। নতুন পাইকারি মূল্যহার অনুযায়ী শহরাঞ্চলে বিদ্যুৎ বিতরণে নিয়োজিত ডেসকোর ৩৩ কেভি লাইনে প্রতি কিলোওয়াট ঘণ্টা বিদ্যুতের দাম ধরা হয়েছে সর্বোচ্চ ৭ টাকা ৭৪ পয়সা। আর ডিপিডিসির ৩৩ কেভি লাইনের বিদ্যুতের দাম ধরা হয়েছে প্রতি কিলোওয়াট ঘণ্টা ৭ টাকা ৭২ পয়সা। বাংলাদেশ পল্লীবিদ্যুতায়ন বোর্ডের সমিতিগুলোর ৩৩ কেভি লাইনের জন্য প্রতি কিলোওয়াট ঘণ্টা বিদ্যুতের দাম ধরা হয়েছে ৫ টাকা ৩৯ পয়সা যা, পাইকারি বিদ্যুতের সর্বনিম্ন দর।

দীর্ঘদিন ধরে জ্বালানি নিয়ে যারা সরকারের ভূমিকা বিশ্লেষণ করেন তেমন বিশেষজ্ঞদের মতে, বিদ্যুতের পুরো সরবরাহ ব্যবস্থায় সরকার মুনাফা যৌক্তিক করেনি বরং অযৌক্তিক ব্যয় বৃদ্ধি করেছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরণ ব্যয় ও মুনাফা যদি যৌক্তিক করা হতো তাহলে তেল-বিদ্যুৎ, গ্যাসের সরবরাহ ব্যয় কমত এবং সরকারের ভর্তুকি কমত। সরকার বলছে, তারা ভর্তুকি কমানোর চেষ্টা করছে কিন্তু সেটা আর করতে হতো না, দুর্নীতি কমালে এমনিতেই লোকসান কমে যেত তাহলে ভর্তুকি দেওয়ার প্রয়োজনটাও কমে যেত আর মানুষ সহনীয় দামে তেল-গ্যাস, বিদ্যুৎ কিনতে পারত।

দেশে বর্তমানে বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা ২৫ হাজার মেগাওয়াটের কিছু বেশি। তবে ব্যবহার হয় মাত্র সাড়ে ১২ হাজার মেগাওয়াট। ফলে অতিরিক্ত সক্ষমতা থাকলেও উৎপাদন না করে বিদ্যুৎকেন্দ্রকে বসিয়ে রাখতে হয়। কিন্তু চুক্তি অনুযায়ী বিদ্যুৎকেন্দ্রকে বসিয়ে রাখা হলেও এর বিপরীতে ক্যাপাসিটি চার্জ বা সক্ষমতার ব্যয় হিসেবে বিপুল পরিমাণ অর্থ দিতে হচ্ছে সরকারকে প্রতি বছর। গত অর্থবছরের (২০২১-২২) প্রথম ৯ মাসেই (জুলাই-মার্চ) বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর জন্য সক্ষমতা ব্যয় বাবদ সরকারকে গুনতে হয়েছে ১৬ হাজার ৭৮৫ কোটি টাকা। বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির বৈঠকে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের (বিপিডিবি) পক্ষ থেকে এ কথা জানানো হয়েছে।

মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, গত বছরের জুলাই থেকে চলতি বছরের মার্চ পর্যন্ত সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে ৯০টি বিদ্যুৎকেন্দ্র ১৬ হাজার ৭৮৫ কোটি টাকা ভাড়া দেওয়া হয়েছে। প্রতি মাসে গড়ে দেওয়া হয়েছে ১ হাজার ৬৮৫ কেটি টাকা। এর আগে ২০২০-২১ অর্থবছরে ১৮ হাজার ৯৭৭ কোটি টাকা এবং ২০২১-২২ অর্থবছরে দেওয়া হয়েছে ১৮ হাজার ১২৩ কোটি টাকা। অর্থাৎ প্রায় তিন বছরে ভাড়া দেওয়া হয়েছে ৫৩ হাজার ৮৮৫ কোটি টাকা।

একটু তুলনা করে দেখা যাক, পদ্মা সেতু তৈরি করতে খরচ হয়েছে ৩০ হাজার ২৯৩ কোটি টাকা। বাংলাদেশের বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর এই ক্যাপাসিটি চার্জ দেওয়া হয় ভাড়াভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র রেন্টাল ও কুইক রেন্টাল, ভারত থেকে আমদানি করা বিদ্যুৎ এবং ইনডিপেনডেন্ট পাওয়ার প্রডিউসারদের (আইপিপি) কাছে। ভারতের আদানি গ্রুপ এখনো বিদ্যুৎ উৎপাদনে যায়নি। কিন্তু ২০১৭ সালে পিডিবি তাদের কাছ থেকে বিদ্যুৎ আমদানির চুক্তি করে। ওই চুক্তির কারণে এ পর্যন্ত বাংলাদেশের কাছে তাদের পাওনা হয়েছে ১ হাজার ২১৯ কোটি টাকা। আরও কয়েকটা উদাহরণ দেখা যেতে পারে। যেমন, কেরানীগঞ্জের পানগাঁওয়ের এপিআর এনার্জি বিদ্যুৎকেন্দ্রটির ক্ষমতা ৩০০ মেগাওয়াট। ২০১৯-২০ অর্থবছরে কেন্দ্রটি থেকে মাত্র ৩৪ লাখ ৪৮ হাজার কিলোওয়াট ঘণ্টা বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়, যা সক্ষমতার ১ শতাংশেরও কম। কিন্তু কেন্দ্রটিকে ৫৩২ কোটি ৯১ লাখ টাকা ক্যাপাসিটি চার্জ দেওয়া হয়। ফলে আইপিপি কেন্দ্রটির প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয় পড়ে ১ হাজার ৫৭৯ টাকা ৫৭ পয়সা, যা দেশে তো বটেই, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ কেনার সর্বোচ্চ রেকর্ড গড়ে। ২০২০-২১ অর্থবছরে একই বিদ্যুৎকেন্দ্র ৭ কোটি ৭২ লাখ ইউনিট উৎপাদন করায় প্রতি ইউনিটের খরচ পড়েছে ৮৯ টাকা। এই অর্থবছরে সবচেয়ে বেশি দাম পড়েছে ২০০ মেগাওয়াট সক্ষমতার সিরাজগঞ্জের প্যারামাউন্ট বিট্যাক এনার্জি লিমিটেডের উৎপাদিত বিদ্যুতের। প্রতি ইউনিটের দাম পড়েছে ১৮০ টাকা। ১৫২ টার বেশি বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে, অথচ বাংলাদেশের বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর উৎপাদন সক্ষমতার ৪০ থেকে ৪৮ ভাগ গড়ে অব্যবহৃত থাকে। কিন্তু তাদের কাছ থেকে বিদ্যুৎ না কিনলেও ভাড়া দিতে হয়। ফলে ইউনিট প্রতি বিদ্যুতের অনেক দাম বেড়ে যায়। এখন আরও নতুন কটি বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের কাজ দ্রুত এগিয়েছে চলছে। ফলে বসিয়ে রেখে ক্যাপাসিটি চার্জ দেওয়া কমবে না।

সরকার বিদ্যুৎকে সেবা খাত নয় বাণিজ্যিক খাত হিসেবে বিবেচনা করে রাজস্ব আহরণের খাত বানিয়ে ফেলেছে। এবং এই খাত থেকে সরকার ১৮ শতাংশ পর্যন্ত মুনাফা করছে। এর জন্য যে প্রক্রিয়া চালু করেছে তাতে দেশে প্রাতিষ্ঠানিক লুণ্ঠনের একটি পদ্ধতি তৈরি হয়ে গেছে। দেশের উন্নয়ন আর উৎপাদনের স্বার্থে এই খাতকে বাণিজ্যিক নয়, জনমুখী করা দরকার ছিল। আর সেটা করতে চাইলে এই খাত এবং বোর্ড থেকে বা প্রশাসনিক দায়িত্ব থেকে আমলাদের সরাতে হবে। এমন আরও অনেক সংস্কার প্রস্তাব সরকারকে বারবার দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু কেন সেসব শোনা হচ্ছে না, তাদের প্রস্তাবের কোনো দুর্বলতা আছে কি, তা জানা নেই কারও। তবে এটা পরিষ্কার যে, এই বিষয়গুলো বিবেচনায় নিলে বিদ্যুতের দাম বাড়ানো নিয়ে এত বিতর্ক বা জনদুর্ভোগ সৃষ্টি হতো না।

বিদ্যুতের পাইকারি দাম বাড়ানো হয়েছে এমন খবরে বিতরণ কোম্পানিগুলোও নড়েচড়ে উঠেছে। তারাও গ্রাহকপর্যায়ে বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর আবেদন তৈরি করছে। পাইকারি বিদ্যুতের দরবৃদ্ধি বিবেচনা করে গ্রাহক পর্যায়ে মূল্য বাড়ানোর প্রস্তাব দেবে ছয় বিতরণ কোম্পানি। তাদের দেওয়া প্রস্তাবের ওপর শুনানি করে নতুন মূল্য ঘোষণা করবে বিইআরসি। এরই মধ্যে ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানির (ডিপিডিসি) ব্যবস্থাপনা পরিচালক বলেছেন, পাইকারি মূল্য যে হারে বাড়বে, সে অনুসারে দাম বাড়ানোর প্রস্তাব দেওয়া হবে। এ বিষয়ে কাজ চলছে। ঢাকা ইলেকট্রিক সাপাই কোম্পানি (ডেসকো), নর্দান ইলেকট্রিক সাপাই কোম্পানি এবং ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি (ওজোপাডিকো) জানিয়েছে, তারাও প্রস্তাব তৈরি করছে। অর্থাৎ, গ্রাহকপর্যায়েও বিদ্যুতের দাম বাড়বে অচিরেই।

উন্নয়ন আর উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে বিদ্যুতের সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বিদ্যুৎ জড়িয়ে থাকে জীবনের সব প্রয়োজনের সঙ্গে। বিদ্যুতের দাম তাই ভাবিয়ে তোলে সব মহলকে। বিদ্যুৎ ব্যবসায়ীদের স্বার্থ, সরকারের ভুলনীতি, নানা ধরনের অপচয়, অপব্যয়, দুর্নীতি সবকিছুরই প্রভাব পড়ে বিদ্যুতের দাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে। দাম বাড়ানোর ফলে কৃষি-শিল্প, পরিবহন, চিকিৎসা-শিক্ষা, বিনোদনের সব শাখায় ব্যয় বৃদ্ধির আঘাতে জনজীবন আরও বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে। ফলে বিদ্যুতের দাম বাড়ানো নয় বিদ্যুতের জন্য রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ বাড়ানো এবং দুর্নীতি কমানোটাই এখন জরুরি। কিন্তু সে পথে না হেটে বর্তমান দুর্নীতির পৃষ্ঠপোষক সরকার জ্বালানির দাম বৃদ্ধির কর্তৃত্ব নিজের হাতে নিয়ে নিচ্ছে। এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের গণশুনানি করার যে বাধ্যবাধকতা ছিল সেই আইনের পরিবর্তন ঘটিয়ে সরকারের সিদ্ধান্তেই দাম নির্ধারণ করা যাবে এই আইন করা হচ্ছে। ফলে জনগণের জন্য ভর্তুকি কমবে আর বিদ্যুৎ ব্যবসায়ীদের জন্য ভর্তুকি ও সহায়তা বাড়বে। যার অনিবার্য ফল ক্রমাগত বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি এবং জনগণের উপর মূল্যবৃদ্ধির দুঃসহ ভার চেপে বসে। ফলে মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদের সাথে সাথে রাজনৈতিক পরিবর্তনের সংগ্রাম গড়ে তোলাটা জরুরি।

কুতুবপুর ইউনিয়ন : নারায়ণগঞ্জ

বাসদ কার্যালয় বন্ধের হুমকি প্রদানকারী সরকার দলীয় সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার দাবি

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ নারায়ণগঞ্জ জেলার আহ্বায়ক নিখিল দাস ও সদস্যসচিব আবু নাঈম খান বিপ্লব ১১ ডিসেম্বর '২২ সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশের জন্য এক বিবৃতিতে বাসদ কুতুবপুর ইউনিয়ন কার্যালয় বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি প্রদানকারী সরকার দলীয় সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার ও বিচার দাবি করেন।

বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ বলেন, গত ৯ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬ টায় ফতুল্লা থানার দক্ষিণ রসুলপুর এলাকায় অবস্থিত বাসদ কতুবপুর ইউনিয়ন কার্যালয়ে সরকার দলীয় ১৪-১৫ জন সন্ত্রাসী প্রবেশ করে অফিসে উপস্থিত নেতাকর্মীদের অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে। সন্ত্রাসীরা এই সময়ে অনুপস্থিত বাসদ ফতুল্লার থানার সদস্যসচিব ও কুতুবপুর ইউনিয়নের আহ্বায়ক এস এম কাদিরকে খোঁজাখুঁজি করে এবং বলে, এই আফিস থেকে সরকার বিরোধী আন্দোলন পরিচালনা করা হয় এজন্য অফিস বন্ধ করে দিতে হবে। অফিস বন্ধ না করলে এস এম কাদিরকে খুন করা হবে বলে হুমকি দিয়ে চলে যায়। সন্ত্রাসীরা ১১ ডিসেম্বর সকালেও এস এম কাদিরের বাসার সামনে ও দলীয় কার্যালয়ের সামনে তার অনুপস্থিতিতে ভয়ভীতিসহ হুমকি প্রদান করে। এ বিষয়ে আজ ফতুল্লা মডেল থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করা হয়। ডায়েরি নাম্বার হলো ৮০৭।

নেতৃবৃন্দ বলেন, বর্তমান গণবিচ্ছিন্ন সরকার দমন-পীড়ন চালিয়ে সারা দেশে বিরোধী আন্দোলনকে বন্ধ করার চেষ্টা করছে। সভা-সমাবেশ করার সাংবিধানিক অধিকার চর্চারও সুযোগ দিচ্ছে না। বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের উপর সরকার দলীয় সন্ত্রাসীদের লেলিয়ে দিয়েছে এবং অফিস বন্ধ করার হুমকি দিয়েছে।

নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে বাসদ নেতাকে হত্যার ও অফিস বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি প্রদানকারী সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার ও বিচার দাবি জানান।

বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসুর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

বিজ্ঞান আন্দোলন মঞ্চ : মাগুরা

বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসুর ৮৫তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে বিজ্ঞান আন্দোলন মঞ্চ মাগুরা জেলা শাখার উদ্যোগে ২৩ নভেম্বর '২২ সৈয়দ আতর আলী পাবলিক লাইব্রেরি মিলনায়তনে আলোচনা সভা, কুইজ প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়।

বিজ্ঞান আন্দোলন মঞ্চের কেন্দ্রীয় সদস্য প্রকৌশলী শম্পা বসুর সভাপতিত্বে সভায় আলোচনা করেন শিক্ষাবিদ কাজী নজরুল ইসলাম ফিরোজ, নাজির আহমেদ কলেজের সহকারি অধ্যাপক ধ্রুব কুমার দাম, মাগুরা জেলার বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও কবি ওহিদ কামাল বাবলু, ডা. অমরেন্দ্র নাথ দেওরি, বিজ্ঞান আন্দোলন মঞ্চ জেলা শাখার সংগঠক গোলাম পারভেজ। সভা পরিচালনা করেন বিজ্ঞান আন্দোলন মঞ্চের জেলা সংগঠক নাফিসা নাওয়ার নিঝুম।

আলোচকবৃন্দ বলেন, বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসু ছিলেন একজন বাঙালি পদার্থবিজ্ঞানী, উদ্ভিদবিজ্ঞানী ও জীববিজ্ঞানী এবং প্রথম দিকের একজন কল্পবিজ্ঞান রচয়িতা। ভারতীয় উপমহাদেশে তিনি ব্যবহারিক ও গবেষণাধর্মী বিজ্ঞানের সূচনা করেন। ভারতবর্ষে আধুনিক বিজ্ঞান প্রচলনের পথিকৃৎ ছিলেন বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসু। তাঁর কারণেই এ অঞ্চলে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা প্রয়াস পেয়েছে। বিজ্ঞানী মার্কনি রেডিও আবিষ্কারের আগেই বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসু বিনা তারে এক স্থান থেকে আরেক স্থানে তথ্য-সংকেত বিনিময়ে সক্ষম হয়েছিলেন এবং প্রদর্শনও করেছিলেন। তিনি সব সময় জীব ও জড়ের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান খুঁজতেন।

তিনি বলেছিলেন, মানুষ যেভাবে সাড়া দেয়, গাছও একইভাবে সাড়া দেয়। সে সময় উদ্ভিদকে জড় হিসেবেই দেখা হতো। পৃথিবীর বড় বিজ্ঞানীরা যেখানে ৬০ মিলিমিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্যরে রেডিওয়েভ নিয়ে কাজ করতে পারছিলেন না, সেখানে জগদীশ চন্দ্রই প্রথম পাঁচ মিলিমিটার দৈর্ঘ্যের রেডিও তরঙ্গে সংকেত বিনিময় আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি দুইশ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করেছিলেন। জগদীশ চন্দ্র বসু রাতের অন্ধকারে ছবি তোলার উপযোগী ক্যামেরাও বানিয়েছিলেন। সাহিত্যের প্রতিও তাঁর প্রবল অনুরাগ ছিল। বিজ্ঞানী আইনস্টাইন বলেছিলেন, 'জগদীশ চন্দ্র যেসব অমূল্য তথ্য পৃথিবীকে উপহার দিয়েছেন তার যেকোনোটির জন্য বিজয়স্তম্ভ তৈরি করা উচিত।' বিজ্ঞানের ও জ্ঞানগজতের বিভিন্ন শাখায় জগদীশ চন্দ্র বসু কাজ করেছিলেন শুধু সত্য জানার উদ্দেশ্যে। আজকের ছাত্র ও তরুণ প্রজন্মের জন্য তিনি অনুকরণীয় ও স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব।

গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ, দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম গড়ে তুলুন

রাজনৈতিক দলের অফিসে হামলা-ভাঙচুর, তালাবন্ধ করা, নেতৃবৃন্দকে অফিসে ঢুকতে না দেওয়া, সভা-সমাবেশে বাধা প্রদান, গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ, গণগ্রেপ্তারের প্রতিবাদে বাম গণতান্ত্রিক জোটের উদ্যোগে ১৩ ডিসেম্বর '২২ ঢাকার পুরানা পল্টন মোড়ে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বাম গণতান্ত্রিক জোটের সমন্বয়ক, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) 'র সাধারণ সম্পাদক কমরেড রুহিন হোসেন প্রিন্সের সভাপতিত্ব সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ, বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগের ডা. হারুন উর রশীদ, বাসদ (মার্কসবাদী)'র সমন্বয়ক মাসুদ রানা, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির শহিদুল ইসলাম সবুজ ও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের রুবেল সিকদার। সমাবেশ শেষে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, সরকার প্রতিনিয়ত জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নিয়ে চরম ফ্যাসিবাদী পথে হাটছে; ধ্বংস করছে রাজনৈতিক সংস্কৃতি। এর বিরুদ্ধে বাম প্রগতিশীল ও গণতন্ত্রমনা মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ করতে হবে।

সার, ডিজেল-কীটনাশক ও কৃষি উপকরণের দাম কমানোসহ ৬ দফা দাবিতে স্মারকলিপি পেশ

কৃষক ও ক্ষেতমজুর সংগ্রাম পরিষদ মৌলভীবাজার জেলা শাখা

৭ ডিসেম্বর '২২ কৃষক ও ক্ষেতমজুর সংগ্রাম পরিষদ মৌলভীবাজার জেলা শাখার উদ্যোগে চৌমুহনায় সমাবেশ শেষে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে কৃষিমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্ট মৌলভীবাজার জেলা সমন্বয়ক অ্যাড. মঈনুর রহমান মগনুর সভাপতিত্বে এবং বিশ্বজিৎ নন্দীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ জাসদ মৌলভীবাজার জেলা সভাপতি আ স ম সালেহ সোহেল, বাংলাদেশ কৃষক সমিতি জেলার সাধারণ সম্পাদক জওহর লাল দত্ত, বাংলাদেশ কৃষক জোট জেলা সংগঠক হাসান আহমেদ রাজা, এ টি এম আলমগীর, হাওর রক্ষা সংগ্রাম কমিটি মৌলভীবাজার সদর উপজেলা সভাপতি আলমগীর হোসেন প্রমুখ।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, বাংলাদেশের প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ মানুষ প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। বাজারে সার, বীজ, ডিজেল, কীটনাশকসহ সকল কৃষি উপকরণের দাম বৃদ্ধি পেয়ে আকাশচুম্বী। বৃদ্ধি পেয়েছে কৃষি খরচ কিন্তু কৃষক ফসলের প্রকৃত দাম পাচ্ছে না। বিএডিসি এর নিয়ন্ত্রণের বাইরে গিয়ে লুটেরা বহুজাতিক কোম্পানির নিয়ন্ত্রণে সার, বীজ, কীটনাশকসহ সকল উপকরণ। মুনাফার লোভে দাম বাড়িয়ে বাজারে কৃষি উপকরণ বিক্রি করছে। আবার ভেজাল বীজ, সার, কীটনাশক কিনে প্রতারিত হচ্ছে কৃষক। দেশের হাজার হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচার হচ্ছে কিন্তু কৃষক-কৃষিকাজের জন্য ঋণ নিতে গেলে ঋণ পাচ্ছে না। বাজারে বৃদ্ধি পাচ্ছে চাল-ডাল, তেল-লবণসহ সকল নিত্যপণ্য। কিন্তু কৃষক ও মেহনতি মানুষ তার যথাযথ হিস্যা পাচ্ছে না। প্রতিবছর জাতীয় বাজেটে সামরিক, প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধি পায়। আর উৎপাদনমুখী কৃষি, শিক্ষা-স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান খাতে বছরে বছরে ব্যয় বরাদ্দ কমছে। সরকার হাজার হাজার কোটি টাকা পাচারকারীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা না নিয়ে বরং পাঁচ থেকে পনেরো হাজার টাকা ঋণের জন্য কৃষকের নামে সার্টিফিকেট মামলা দায়ের হচ্ছে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, দেশে কৃষক-খেতমজুর, শ্রমিকদের জন্য নেই রেশনিং ব্যবস্থা। কৃষক খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করে কিন্তু কৃষক-শ্রমিক সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকার সমস্যার সমাধান করা হচ্ছে না। এমন পরিস্থিতিতে কৃষক ও ক্ষেতমজুর সংগ্রাম পরিষদের ৬ দফা দাবি বাস্তবায়ন সময়ের দাবি।

৬ দফা দাবি–

১. সার-ডিজেল, কীটনাশকসহ সকল কৃষি উপকরণের দাম কমাতে হবে।

২. প্রত্যেক ইউনিয়নে সরকারি ক্রয়কেন্দ্র খুলে সরাসরি কৃষকদের কাছ থেকে ধান ক্রয় করতে হবে।

৩. চাল-ডাল, তেলসহ সকল নিত্যপণ্যের দাম কমাতে হবে।

৪. আর্মি রেটে রেশনিং চালু করতে হবে।

৫. কৃষি খাতে ভর্তুকি বাড়াতে হবে।

৬. শস্য বিমা চালু করতে হবে।

শিশু কিশোর মেলার আয়োজনে, ক্ষুদিরাম বসুর জন্ম দিবস পালিত

বিপ্লবী কিশোর ক্ষুদিরাম বসুর ১৩২তম জন্ম দিবস উপলক্ষে শিশু কিশোর মেলা কুমিল্লা জেলা শাখার উদ্যোগে ৩ ডিসেম্বর '২২ জেলা কার্যালয়ে আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠক বিশাল দাসের সভাপতিত্বে উক্ত সভায় বক্তব্য রাখেন শিশু কিশোর মেলার কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা আবদুর রাজ্জাক, চারণ সংস্কৃতি কেন্দ্র কুমিল্লা জেলার সংগঠক মানিক কর, সীমান্ত ও আহসান উল্লাহ।

শিক্ষা ও গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে গণতান্ত্রিক ছাত্র জোটের আত্মপ্রকাশ

প্রগতিশীল ছাত্র জোট ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ছাত্র ঐক্যভুক্ত আটটি বামপন্থি ছাত্র সংগঠনের সমন্বয়ে ছাত্র অধিকার ও দুঃশাসনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের বার্তা নিয়ে 'গণতান্ত্রিক ছাত্র জোট'-এর আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। গত ৩০ নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই জোটের আত্মপ্রকাশ ঘটে। শিক্ষার উপর শাসকদের অব্যাহত বাণিজ্যিক আক্রমণ প্রতিরোধ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গণতান্ত্রিক পরিবেশ রক্ষা, সন্ত্রাস-দখলদারীত্বের বিরুদ্ধে কার্যকর ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার প্রত্যয় নিয়ে এই জোটের ঘোষণা দেয়া হয়। একই সাথে চলমান আওয়ামী ফ্যাসিবাদী দুঃশাসনের বিরুদ্ধে ছাত্র সমাজকে সংগঠিত করবে গণতান্ত্রিক ছাত্র জোট।

আত্মপ্রকাশ উপলক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের সভাপতি মুক্তা বাড়ৈ, সাধারণ সম্পাদক শোভন রহমান, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি নজির আমিন চৌধুরী জয়, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট (মার্কসবাদী)-এর সভাপতি সালমান সিদ্দিকী, বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রীর সভাপতি সাদেকুল ইসলাম সোহেল, বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি মিতু সরকার, গণতান্ত্রিক ছাত্র কাউন্সিলের সভাপতি সায়েদুল হক নিশান, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সভাপতি সুনয়ন চাকমা, বিপ্লবী ছাত্র যুব আন্দোলনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি তাওফিকা প্রিয়া, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি রাজিব কান্তি রায় এবং সাধারণ সম্পাদক সুহাইল আহমেদ শুভ।

সংবাদ সম্মেলনের লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, ২০১৪ সালের একতরফা নির্বাচন এবং ২০১৮ সালের ভোট ডাকাতির নির্বাচনের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসীন রয়েছে আওয়ামী লীগ সরকার। দীর্ঘ ১৪ বছর ধরে শোষণ-লুণ্ঠন, অর্থপাচার, দুর্নীতির মাধ্যমে দেশে এক দুর্বৃত্তের রাজত্ব কায়েম করেছে। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনসহ নানা কালাকানুন দিয়ে স্বাধীন মত প্রকাশে বাধা ও বিরোধী মত দমন করছে। গণতান্ত্রিক আন্দোলনে পুলিশি আক্রমণ, মিছিলে প্রকাশ্য গুলি করে হত্যাসহ, গুম-খুনের মাধ্যমে দেশে ফ্যাসিবাদী শাসন দীর্ঘায়িত করে চলছে। প্রতিনিয়ত বাড়ছে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম। দেশে দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকা একদলীয় ফ্যাসিবাদী দুঃশাসনে জনজীবনে নেমে এসেছে সীমাহীন দুর্ভোগ আর শাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি। আওয়ামী উন্নয়নের স্লোগান পরিণত হয়েছে ফাঁপা বুলিতে। আওয়ামী লীগ শাসনের ১৪ বছরে গ্যাসের দাম বাড়িছে আড়াই গুণ, বিদ্যুতের দাম বড়িয়েছে দুই গুণ, ৭ বার বড়িয়েছে জ্বালানি তেলের দাম, ওয়াসার পানির দাম বাড়িয়েছে ১৩ বার, বাড়িয়েছে সারের দাম। মানুষের আয় বাড়েনি কিন্তু ব্যয় বাড়ছে প্রতিনিয়ত।

আরও বলা হয়, শিক্ষাঙ্গনের পরিস্থিতি আরও খারাপ। ক্রমাগত বাড়ানো হচ্ছে শিক্ষা ব্যয়। শিক্ষার বেসরকারিকরণ, বাণিজ্যিকীকরণ ও শিক্ষা সংকোচন নীতি বেপরোয়া গতিতে এগিয়ে নিচ্ছে সরকার। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সন্ত্রাসী তাণ্ডব চালাচ্ছে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্তৃপক্ষও সরাসরি সরকারের আজ্ঞাবাহীতে পরিণত হয়েছে। প্রশাসনিক মদদে টর্চার সেল প্রতিষ্ঠা করে সিট বণ্টন-বাণিজ্যসহ গণরুম-গেস্টরুম পরিচালনা করে গোটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একক আধিপত্য-সন্ত্রাস কায়েম করেছে ছাত্রলীগ।

'টাকা যার শিক্ষা তার' এই নীতিতে চলছে শিক্ষাব্যবস্থা। জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২০ এর মাধ্যমে শিক্ষাকে আরও বাণিজ্যিক ও সংকুচিত করে ফেলার চেষ্টা হচ্ছে। প্রাথমিকেই আরও ব্যাপক সংখ্যায় শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার কারণ হবে এই শিক্ষাক্রম। বিজ্ঞান শিক্ষাকে সংকোচিত করে তথাকথিত চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের উপযোগী একদল টেকনোক্রেট তৈরির নীলনকশা বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া শুরু হবে। করোনা মহামারির সময়ে লাখ লাখ শিক্ষার্থী পরিবারিক অভাব অনটনের কারণে কাজের সাথে যুক্ত হয়েছে। অনেক শিক্ষার্থী বেতন-ফি দিতে না পারায় ঝরে পড়েছে। সেসময় সরকার বড় বড় ব্যবসায়ীদের বিপুল অর্থ প্রণোদনা দিলেও শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। ইতিমধ্যে কাগজ ও শিক্ষা উপকরণের মূল্য মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। যা সারাদেশের দরিদ্র-মধ্যবিত্ত শ্রেণির লাখ লাখ শিক্ষার্থীর শিক্ষার উপর একটা বিরাট আক্রমণ। ক্ষমতায় টিকে থাকতে হেফাজতে ইসলামসহ মৌলবাদী শক্তির সাথে আঁতাত করে পাঠ্য পুস্তকে ছড়ানো হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প। বিশ্বব্যাংকের পরামর্শে ইউজিসি'র ২০ বছর মেয়াদি কৌশলপত্র বাস্তবায়ন করা হচ্ছে (সাম্প্রতিক সময়ে এর মেয়াদ চার বছর বাড়িয়ে ২০৩০ সাল পর্যন্ত করা হয়েছে)। কৌশলপত্রের অংশ হিসেবে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পিপিপি- হেকেপ চালুর মধ্য দিয়ে বেসরকারিকরণের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা হচ্ছে। ক্রমাগত ফি বৃদ্ধি, বেসরকারি শিক্ষা খাতে কর আরোপ, উচ্চ শিক্ষা সংকোচন, ভর্তি বাণিজ্য সবই চলছে বেশ জোরে শোরেই।

এ অঞ্চলে বিভিন্ন জাতিসত্ত্বার মানুষ একটি বৈষম্যহীন, গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য জীবন দিয়েছে। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামসহ পাহাড় কিংবা সমতলে বিভিন্ন জাতিসত্ত্বার মানুষের সাংবিধানিক স্বীকৃতি, ভূমির অধিকার কিংবা সংস্কৃতি-ঐতিহ্য, কৃষ্টি সংরক্ষণের অধিকার আজও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এই রাষ্ট্রব্যবস্থা—স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ১১ দফা নির্দেশনার মাধ্যমে কার্যত পাহাড়ে অঘোষিত সেনাশাসন জারি রেখেছে। পাহাড়িদের প্রথাগত ভূমি ব্যবস্থাপনাকে অস্বীকার করে বংশ পরম্পরায় ভোগদখলীয় জমি বেদখল এবং বসতভিটা থেকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে। নির্বিচারে নারী ধর্ষণ-নির্যাতন, অগ্নি সংযোগ-লুণ্ঠন চলছে।

কৃষক তার ফসলের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে না। দিন দিন তারা সর্বস্বান্ত হচ্ছেন। স্বাধীনতার এত বছর পরেও শ্রমিকদের জন্য জাতীয় কোন নূন্যতম মজুরি আইন নেই। অন্যদিকে বিগত ১৪ বছরের আওয়ামী লীগ শাসনামলে মেগা প্রজেক্টের আড়ালে মেগা দুর্নীতির সমারোহ চলছে। প্রতিবছর দেশ থেকে প্রায় ৮০ হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচার, ঋণখেলাপিদের কোটি কোটি টাকার ঋণ মওকুফ, দেশের সম্পদ বিদেশিদের হাতে তুলে দেওয়া খুব সাধারণ ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। ঘরে কিংবা বাইরে নারী ও শিশু ধর্ষণ-নির্যাতনের মাত্রা ভয়ংকরভাবে বেড়েই চলেছে। এই রাষ্ট্র নারীর জন্য কোনো সুরক্ষার ব্যবস্থা করেনি বরং প্রণয়ন করেছে নারী স্বার্থ বিরোধী নানা আইন। গণতান্ত্রিক ছাত্র জোটের লক্ষ্য হিসেবে বলা হয়, গণতান্ত্রিক ছাত্র জোট শিক্ষার গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা এবং শিক্ষার্থীদের ন্যায়সঙ্গত দাবিতে আন্দোলন গড়ে তুলবে, আওয়ামী ফ্যাসিবাদী দুঃশাসনের বিরুদ্ধে জনজীবনের সমস্যা সংকট নিরসনে এবং জাতীয় সম্পদ রক্ষায় আন্দোলন গড়ে তুলবে, শ্রমিক-কৃষক, মেহনতি ও নিপীড়িত জনগণের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে ভূমিকা পালন করবে, সারাবিশ্বে নিপীড়িত মুক্তিকামী মানুষের গণতান্ত্রিক লড়াইয়ে সমর্থন জানাবে এবং সাম্রাজ্যবাদ ও আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রাম করবে।

গণতান্ত্রিক ছাত্র জোটের পক্ষ থেকে এই মুহূর্তের আশু করণীয় হিসেবে ১৩ দফা দাবিনামা ঘোষণা করা হয়, যা হলো–

১. আওয়ামী ফ্যাসিবাদী সরকারকে পদত্যাগ করতে হবে।

২. সর্বজনীন, বৈষম্যহীন, বিজ্ঞানভিত্তিক, গণতান্ত্রিক একই ধারার শিক্ষানীতি প্রণয়ন কর। শিক্ষার বাণিজিকীকরণ-বেসরকারিকরণ, সাম্প্রদায়িকীকরণ ও শিক্ষা সংকোচন নীতি বাতিল কর। জাতীয় শিক্ষাক্রম-২০২০ বাতিল কর।

৩. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গণতান্ত্রিক পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। প্রশাসনিক তত্ত্বাবধানে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় হলে সিট বণ্টন করতে হবে। গণরুম ও গেস্টরুম বন্ধ করতে হবে। ডাকসুসহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত ছাত্র সংসদ নির্বাচন দিতে হবে।

৪. বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করতে হবে। পদাধিকারবলে রাষ্ট্রীয় প্রধান আচার্য এই বিধান বাতিল করে বরেণ্য ও সর্বজন গ্রহণযোগ্য শিক্ষাবিদকে আচার্য হিসেবে নিয়োগ দিতে হবে। ইউজিসি'র কৌশলপত্র, হেকেপ, পিপিপিসহ বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ-এর পরামর্শে চালু সকল শিক্ষাধ্বংসী প্রকল্প বাতিল কর।

৫. বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর আরোপ করা চলবে না। বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতন-ফি কমাও এবং অভিন্ন নীতিমালা ও বেতন কাঠামো নির্ধারণ কর।

৬. জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাবি অধিভুক্ত কলেজসমূহে পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ, ক্লাসরুম ও স্বতন্ত্র পরীক্ষা হল নির্মাণ করে নিয়মিত শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা কর।

৭. শিক্ষাখাতে জাতীয় বাজেটের ২৫% বরাদ্দ কর। পাঠ্যসূচি থেকে ইতিহাস বিকৃতি ও প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িক উপাদান বাতিল কর। পাঠ্যপুস্তকে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাস ও সংগ্রামীদের জীবনী অন্তর্ভুক্ত কর। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উগ্রজাতীয়তাবাদী শপথ বাক্য পাঠের আদেশ বাতিল কর।

৮. ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ওটিটি নিয়ন্ত্রণ নীতিমালাসহ সকল গণবিরোধী ও অগণতান্ত্রিক আইন বাতিল কর। গণতান্ত্রিক অধিকার ও মত প্রকাশের অধিকার নিশ্চিত কর। গণতান্ত্রিক আন্দোলনে পুলিশি আক্রমণ বন্ধ কর। রাষ্ট্রীয়ভাবে গুম-খুন, নির্যাতন ও বিনা বিচারে হত্যা বন্ধ কর। সকল মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার ও রাজবন্দিদের নিঃশর্ত মুক্তি দাও।

৯. পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনা শাসন বন্ধ কর ও স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত কর। সকল জাতিসত্ত্বার সাংবিধানিক স্বীকৃতি, আত্মনিয়ন্ত্রণ ও সাংস্কৃতিক বিকাশের পরিবেশ নিশ্চিত কর। ধর্মীয়, জাতিগত ও ভাষাগত সংখ্যালঘুদের উপর নিপীড়ন বন্ধ কর এবং রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার বন্ধ কর।

১০. রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, রামপাল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রসহ প্রাণ-প্রকৃতিবিনাশী লুটপাটের মেগাপ্রজক্ট বাতিল কর। প্রকৃতি ও পরিবেশবান্ধব প্রকল্প বাস্তবায়নের নীতিমালা গ্রহণ কর। সাম্রাজ্যবাদী ও আধিপত্যবাদী দেশসমূহের সাথে সম্পাদিত জনস্বার্থবিরোধী সকল চুক্তি বাতিল ও জাতীয় সম্পদে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা কর।

১১. দ্রব্যমূলের উর্ধ্বগতি নিয়ন্ত্রণে পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চালু করতে হবে। সকল নাগরিকের জন্য রেশন কার্ড প্রবর্তন ও সারাদেশে ন্যায্যমূল্যের পর্যাপ্ত দোকান খুলতে হবে।

১২. শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি ও কৃষকের উৎপাদিত ফসলের লাভজনক মূল্য নিশ্চিত করতে হবে। কৃষিসহ সেবাখাতে রাষ্ট্রীয় ভর্তুকি তুলে নেয়ার পরিকল্পনা বাতিল কর। দুর্নীতি, অর্থপাচার ও লুটপাটের জন্য দায়ীদের তালিকা প্রকাশ কর এবং শাস্তি দাও। তেল-গ্যাস, পানি ও বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি বন্ধ কর।

১৩. নারী স্বার্থবিরোধী আইন বাতিল কর, ঘরে-বাইরে নারী নির্যাতন বন্ধ কর। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন নিপীড়ন বিরোধী সেল কার্যকর কর।

দুর্নীতির ইঞ্জিন টানছে উন্নয়নের রঙ্গিন বগি; নিচে চাপা পড়ছে দরিদ্র খেটে খাওয়া মানুষ

পঞ্চম পৃষ্ঠার পর

আটা রেশনে পাওয়ার ব্যবস্থা চালু কর। কর্মহীন সকল নাগরিকের জন্য বেকার ভাতা চালু কর।

৪. সারা দেশের গ্রাম-শহরের গুরুত্বপূর্ণ হাট-বাজারে কৃষিপণ্য লাভজনক মূল্যে খোদ কৃষকের কাছ থেকে ক্রয়ের জন্য ক্রয়কেন্দ্র খোল। একই ব্যবস্থায় ন্যায্যমূল্যে কৃষি উপকরণ পাওয়ার ব্যবস্থা কর। পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন কর, সমতলের আদিবাসীদের দাবি পূরণ কর।

৫. শ্রমিকদের ন্যূনতম জাতীয় মজুরি ২০ হাজার টাকা আইন করে বাস্তবায়ন কর। শ্রম আইনের অগণতান্ত্রিক ধারা বাতিল কর। সারাদেশে নারীদের জন্য হোস্টেল ও শিশুদের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার চালু কর।

৬. শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে বাণিজ্য বন্ধ কর। উভয় ক্ষেত্রে জাতীয় বাজেটের যথাক্রমে ২৫ ভাগ ও জিডিপি'র ৬ ভাগ বরাদ্দ কর। সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত কর ও সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র সংসদ নির্বাচন দাও।

৭. বিদেশিদের সাথে সম্পাদিত সকল চুক্তি প্রকাশ কর। দেশ ও জাতীয় স্বার্থ বিরোধী চুক্তিসমূহ বাতিল কর।

শোষণমূলক, দমনপীড়নের রাজনীতি, লুটপাট ও দুঃশাসন মোকাবিলায় রাজনৈতিক সংগ্রামের বিকল্প নেই। আন্দোলনের পথেই জনগণের অধিকার অর্জিত হতে পারে। তাই আসুন আন্দোলনকে শক্তিশালী করি।

খেলায় জয় কার, পরাজিত কে?

রাজনীতিকে কখনো কখনো যুদ্ধ বলে মনে করেন মানুষ। বলা হয়, রাজনীতি হলো রক্তপাতহীন যুদ্ধ আর যুদ্ধ হলো রক্তপাতময় রাজনীতি। তবে কিছুদিন ধরে বাংলাদেশের রাজনীতির মাঠে খেলা হবে কথাটি চালু করার চেষ্টা চলছে। ক্ষমতাসীন দলের সাধারণ সম্পাদক প্রায় প্রতিটি সমাবেশে প্রতিপক্ষকে উদ্দেশ্য করে একথা বলেছেন এবং কর্মীদের সহর্ষ সমর্থন পেয়েছেন। ১০ ডিসেম্বর ঢাকায় বিএনপির সমাবেশকে কেন্দ্র করে উত্তেজনার পারদ চড়িয়েছে আওয়ামী লীগ-বিএনপি উভয়পক্ষই। টানটান উত্তেজনা, আতঙ্ক, মহড়া আর পাহারার মধ্য দিয়ে পার হয়েছে ১০ ডিসেম্বর।

ফলে সমাবেশ, সংঘর্ষ আর আতঙ্কের আবহ নিয়ে ২০২২ সালের ডিসেম্বর মাসের প্রথমার্ধ কেটে গেল। বাংলাদেশে ডিসেম্বর মাস বিজয়ের মাস বলে বিবেচিত। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিজয় ছিনিয়ে এনেছিল বাংলার মুক্তিযোদ্ধারা আর ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনেও বিজয় এনেছিল ছাত্র জনতা। কিন্তু বেদনার সাথেই বলতে হয় দুটো বিজয়ই হাত ছাড়া হয়ে গেছে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে। গণতন্ত্র যেন এখনও অধরাই রয়ে গেল। এবারের ডিসেম্বর এসেছে আতঙ্ক আর উত্তেজনা নিয়ে। রীতিমত তারিখ ঘোষণা করে উত্তেজনাকেও তুঙ্গে তুলে দেয়া হয়েছে।

রাজনীতিতে উত্তেজনা থাকে, বিতর্ক থাকে, কখনও সংঘাতময় পরিস্থিতিও তৈরি হতে পারে। কিন্তু কখনো কখনো তা মাত্রা ছাড়িয়ে সহিংসতা এবং নারকীয়তায় রূপ নেয়। তখন শুধু রাজনৈতিক নয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতিও হয়ে পরে ভয়াবহ। দেশের রাজনীতিতে এমন ভয়াবহ পরিস্থিতি মাঝে মাঝেই উদ্ভব ঘটছে। ১০ ডিসেম্বরে বিএনপির সমাবেশ নিয়ে তেমনি এক পরিস্থিতির আশঙ্কা করছিলেন অনেকে। ১০ ডিসেম্বরে দেখিয়ে দিল সমাবেশ আহ্বানকারীদের ভূমিকা আর ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের মনোভাব, সরকার বিশেষ করে পুলিশের ভূমিকা এবং প্রশাসনের পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণ। এ নিয়ে রাজনৈতিক মহলে আলোচনা, উত্তেজনা আর জনসাধারণের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছিল। আর তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল ৭ ডিসেম্বর। সেদিন নয়াপল্টন এলাকায় সংঘর্ষ, বিএনপি কার্যালয়ে তল্লাসি, অফিস তালাবদ্ধ করে রাখা এবং দলের শীর্ষ নেতাদেরকে গ্রেপ্তারের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক জটিলতার আলামত যেন সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে।

রাজনৈতিক কর্মসূচির অংশ হিসেবেই রাজনৈতিক দলসমূহ সারাদেশে সভা-সমাবেশ করে থাকে। যেমন, ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সমাবেশ করছে তাদের সাফল্য আর স্বপ্নের কথা প্রচার করার জন্য। এসব সমাবেশ থেকে তারা আগামী নির্বাচনের জন্য ভোট চাইতেও শুরু করেছেন। বিএনপি সমাবেশ করে তাদের উপর নিপীড়ন, মামলা-হামলা, তাদের নেতার মুক্তি, দেশের অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সংকট নিরসনের কথা বলছে। বামপন্থিদের জোট এবং বাসদ সমাবেশ করে ব্যাখ্যা করছে দেশের সংকটের কারণ এবং জনগণকে আহবান করছে বিকল্প চিন্তা এবং শক্তি গড়ে তোলার জন্য। রাজনীতিতে এরকম একটা পরিবেশই তো কাম্য। কিন্তু সরকার এবং পুলিশের ভূমিকা সবার ক্ষেত্রে একরকম থাকে না। কারও ক্ষেত্রে পুলিশি বাধা, মামলা-হয়রানি, পরিবহন বন্ধ আর কারও ক্ষেত্রে পুলিশি সর্বাত্মক সহযোগিতা মানুষের মনে প্রশ্নের উদ্রেক করেছে। তৈরি করেছে পুলিশ এবং প্রসাশনের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে অনাস্থা।

এরকম এক পরিবেশে ১০ ডিসেম্বর বিএনপির ঢাকা সমাবেশকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে তৈরি হয়েছিল নানা টানাপোড়েন। সমাবেশের স্থান নিয়ে অনিশ্চয়তা, পাল্টাপাল্টি বিতর্ক আর বিতণ্ডার মাঝেই ঘটে গেল বা ঘটানো হলো বিএনপি কার্যালয়ে পুলিশি অভিযান, গুলিবর্ষণ, মৃত্যু, গ্রেপ্তার আর মামলার ঘটনা। যা পরিস্থিতিকে করে তুলেছিল আরও জটিল এবং সংঘাতময়। আন্দোলনরত রাজনৈতিক দলের অফিসে তালা দেয়ার মতো ন্যাক্কারজনক ঘটনাও ঘটানো হয়েছে।

যে কোন বড় রাজনৈতিক সমাবেশ হলে নেতা, কর্মীরা তো বটেই সাধারণ মানুষও অংশগ্রহণ করে সেখানে। সমাবেশস্থল উপচে পড়ে, ফলে রাস্তা ঘাটে যানবাহন চলাচলে অসুবিধা হয়। সাধারণ মানুষ এসব মেনে নেয় বা মেনে নেয়া ছাড়া উপায় থাকে না। এটাকে অজুহাত করে ক্ষমতাসীন দলের পক্ষ থেকে সমাবেশের স্থান নির্ধারণ আর বরাদ্দ দেয়া নিয়ে তাই তৈরি হয় তীব্র জটিলতা। বিএনপির সমাবেশ নিয়েও তাই হয়েছে। ঢাকায় সমাবেশের স্থান নির্ধারণ নিয়ে জটিলতা তুঙ্গে উঠেছিল। একদিকে সমাবেশের স্থান নিয়ে বিএনপির সঙ্গে পুলিশের আলোচনা অন্যদিকে আওয়ামী লীগ তার পরিকল্পনা অনুযায়ী অগ্রসর হওয়া দুটোই ঘটেছে সমানতালে। ফলে বিএনপির ঢাকার সমাবেশ ঘিরে সরকারের প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ সরাসরি মাঠে ছিল। তাদের মূল লক্ষ্য ছিল বিএনপি যাতে ঢাকায় সাংগঠনিক শক্তি ও জমায়েত দেখাতে না পারে। আর বিএনপি চেয়েছিল যে কোন মুল্যে জমায়েত করতে। উভয়পক্ষের এই ক্ষমতা প্রদর্শনের প্রতিযোগিতার প্রত্যক্ষ ফলাফল হিসেবে সাধারণ মানুষ দুর্ভোগ ছিল সীমাহীন। বিষয়টি কি সরকার, আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি'র নীতি নির্ধারকদের বিবেচনায় ছিল না? দুই পক্ষই বলছেন জনগণের স্বার্থেই তাঁরা এসব কাজ করছেন। কিন্তু বাস্তবে জনগণের দাবি আর স্বার্থ কতটুকু রক্ষিত হয়েছে তা বলাই বাহুল্য। বরং ব্যাপক ধরপাকড় এবং মামলা এক আতঙ্কজনক পরিস্থিতি তৈরি করেছিল। পুলিশ বলেছে এসব রুটিন ওয়ার্ক। কিন্তু মানুষ কী তা ভাবছে? মানুষ ভেবেছে এসব হচ্ছে দমন-পীড়ন। এবং যখন ক্ষমতাসীনদের উপর মহল থেকে বলা হয়েছে, আর কোন ছাড় দেয়া হবে না তখন ব্যাপারটা আরও স্পষ্ট হয়ে যায়। সরকার ছিলেন কঠোর এবং সতর্ক।

ঘটনা শুধু এখানেই বা দেশেই সীমাবদ্ধ ছিল না, ১০ ডিসেম্বর বিশ্ব মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে ১৫টি দেশ যৌথভাবে একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছে। বিবৃতিতে তারা বাংলাদেশের বন্ধু ও অংশীদার হিসেবে এ দেশের সাফল্যকে আরও উৎসাহিত করতে আগ্রহী এবং মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে অবাধ, সুষ্ঠু, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনি প্রক্রিয়ার গুরুত্ব পুনর্ব্যক্ত করেছে।

এই বিবৃতি দিয়েছে অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাজ্য, কানাডা, ডেনমার্ক, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, জাপান, নেদারল্যান্ডস, নরওয়ে, স্পেন, সুইডেন, সুইজারল্যান্ড ও যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস।

বিবৃতিতে তারা বলেছে, আমরা মানবাধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়ন উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের মৌলিক ভূমিকাকে তুলে ধরতে চাই। আমরা মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রে সংরক্ষিত স্বাধীনতা উদযাপন করি এবং ঘোষণাপত্রে বর্ণিত বিভিন্ন অঙ্গীকারের মধ্যে স্বাধীন মত প্রকাশ, শান্তিপূর্ণ সমাবেশ ও নির্বাচন বিষয়ে জাতিসংঘের সব সদস্য রাষ্ট্রের অঙ্গীকার রক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরি।'

'অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণ, সমতা-নিরাপত্তা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক মানবিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অনুসরণীয় মূল্যবোধ ও নীতি হিসেবে আমরা গণতান্ত্রিক শাসনকে সমর্থন ও উৎসাহিত করি।' এই বিবৃতিতে যেসমস্ত ঘোষণা ও অঙ্গিকারের কথা বলা হয়েছে তা শুধু বাংলাদেশ নয় সারা দুনিয়ার জন্যই প্রযোজ্য। তারপরও বাংলাদেশ প্রসঙ্গে তাদের বিবৃতি বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। এরপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাতিসংঘের প্রতিনিধি তাদের উদ্বেগ ও আশাবাদ প্রকাশ করেছেন যা রাজনীতিতে নতুন জটিলতার শঙ্কা তৈরি করেছে। চলমান রাজনৈতিক সংকটে ভারতের মনোভাব এবং চীনের প্রতিক্রিয়া কি তাও বেশ গুরুত্ব বহন করে।

দেশের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক সংকট সবসময় বাইরের হস্তক্ষেপের সুযোগ তৈরি করে। যা কখনই ভালো ফল নিয়ে আসে না। তা জানা সত্ত্বেও ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনীতিতে অবিশ্বাস এবং অনাস্থা চূড়ান্ত রূপ নিয়েছে। দুর্নীতি-লুটপাট ও পুঁজিবাদী শোষণকে নির্বিঘ্ন রাখতে গিয়ে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলো। পুলিশ এবং প্রশাসনের নিরপেক্ষতা যখন প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে তখন যে কোন দেশের জন্য উদ্বেগজনক পরিস্থিতি তৈরি হয়ে পড়ে। সাধারণ মানুষও ভাবতে থাকে ক্ষমতা কেন্দ্রিক বুর্জোয়া দলগুলোর মতো। ফলে আলোচনা থেকে হারিয়ে যায় জনগণের দৈনন্দিন সংকটের বিষয়গুলো। শ্রমিকের মজুরি আর কৃষকের ফসলের দাম তখন আর কোন আলোচনাতেই ঠাঁই পায় না। এর সুফল ভোগ করে সবসময়েই মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ কিন্তু ব্যাপক জনগণের উপর যে দুর্ভোগ নেমে আসে অতীতের সমস্ত ঘটনাই তার স্বাক্ষর বহন করে।

সমাবেশ থেকে ১০ দফা দাবি এবং দলীয় সাংসদদের পদত্যাগের ঘোষণা দিয়েছে বিএনপি এবং ইতিমধ্যে তাদের সংসদ সদস্যরা পদত্যাগপত্র জমাও দিয়েছেন। তাদের সাত জন সদস্য পদত্যাগ করলে সংখ্যার দিক থেকে তেমন কোন সমস্যা হবে না এটা সবাই বুঝেন কিন্তু এর রাজনৈতিক তাৎপর্যকে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। কিন্তু পদত্যাগ করলে সংসদ অচল হবে না বরং পরে পস্তাতে হবে বলে ক্ষমতাসীন দলের সাধারণ সম্পাদক যে বক্তব্য দিয়েছেন তা বিশেষ বিবেচনার দাবি রাখে। রাজনীতিতে কথার লড়াই চলে এটা ঠিক কিন্তু কথা কি রাজনৈতিক সংকটকে প্রশমিত করবে না বাড়িয়ে তুলবে সেই বিবেচনাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ইতিমধ্যে ক্ষমতাসীন দল প্রস্তুতি এবং প্রচার শুরু করেছে নির্বাচন নিয়ে। বিরোধীরা আন্দোলন করছেন সরকারের পদত্যাগ এবং নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবি নিয়ে। একদিকে অর্থনৈতিক সংকট, বিশ্ব পরিস্থিতি উত্তেজনাপূর্ণ, ঋণখেলাপি এবং ব্যাংকের অস্বাভাবিক ঋণ প্রদান, ডলার সংকট বলে আমদানিতে টানাটানি, বেকারত্ব, দ্রব্যমূল্য, জনজীবনের সংকট অন্যদিকে রাজনীতিতে খেলার নামে উত্তেজনা সাধারণ মানুষের উদ্বেগ বাড়িয়ে দিয়েছে। রাজনীতি যদি যুদ্ধ হয়, তাহলে যুদ্ধের দায় বহন করে সাধারণ মানুষ। আর যদি খেলা হয় তাহলে জনগণ কি থাকবে দর্শকের ভূমিকায়? যে কোন মুল্যে সমাবেশ করবেন বলেছিলেন যারা তাঁরা বলছেন তাঁরা জিতেছেন আর পল্টনে সমাবেশ করতে দেয়া হবে না বলেছিলেন যারা, তারা বলছেন আমরা জিতেছি। দুপক্ষই বলছেন তারা বিজয়ী। কিন্তু দুঃশাসন বহাল থাকলে জনগণ কখনই বিজয়ের স্বাদ পাবে না। গণতন্ত্রের সংগ্রাম বিজয়ী করতে হলে বর্তমান দুঃশাসনকে হঠাতেই হবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, রাজনীতিতে যুক্তির চাইতে জেদ এবং প্রতিশোধের স্পৃহা ক্রমাগত বাড়ছে। মারমুখী এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ টিকে থাকতে পারছে না। জনগনের অর্জিত অধিকারগুলো যে কেড়ে নেয়া হচ্ছে তা কিন্তু নজরে আনাই হচ্ছে না। যেমন, জ্বালানি ও বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর ক্ষমতা সরকারের হাতে নিয়ে নেয়া হচ্ছে, এর ফলে গণশুনানিতে যতটুকু জবাবদিহি ছিল তাও আর থাকবে না। ফলে সংকটের কারণ বুঝতে পারা আর তার বিরুদ্ধে আন্দোলন জারি রাখা খুবই দরকার। দেশের বুকে চেপে বসে থাকা ফ্যাসিবাদী দুঃশাসন হঠানোর আন্দোলন যেমন শক্তিশালী করতে হবে, পাশাপাশি বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল লড়াইয়ের জন্য জনগণকেও সম্পৃক্ত করা জরুরি।

ঋণের দায়ে কৃষককে গ্রেপ্তারে নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ

কৃষকের হয়রানি বন্ধ ও ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত কৃষি ঋণের সুদ মওকুফের দাবি

সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটি সভাপতি বজলুর রশীদ ফিরোজ ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুল কুদ্দুস ২৭ নভেম্বর এক বিবৃতিতে ২৫ নভেম্বর পাবনার ঈশ্বরদীতে ঋণ পরিশোধ করতে না পারার কারণে ১২ জন কৃষককে গ্রেপ্তারের তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং অবিলম্বে তাদের মুক্তির দাবি জানান।

নেতৃবৃন্দ বলেন, 'বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক' নামের একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে পাবনার ওই কৃষকরা ২০১৬ সালে 'সবজি চাষি সমিতি' নামের একটি সমিতির ৩৭ জন সদস্য ১৬ লাখ টাকা গ্রুপভিত্তিক ঋণ নেয়। তাঁদের প্রতিজনের ঋণের পরিমাণ ছিল ১০ থেকে ৪০ হাজার টাকা। তারা ইতিমধ্যে যৌথভাবে ১৩ লাখ টাকা পরিশোধ করেছেন। ব্যাংকটি প্রথমে স্বল্প সুদের কথা কৃষককে বলে কিন্তু পরে জানায় ১৫ শতাংশ সুদ দিতে হবে। সেই অনুযায়ী ব্যাংক তাদের কাছে আরও ১২ লাখ টাকা দাবি করে। কৃষকরা বাকি টাকা সময়মতো পরিশোধ করতে না পারলে ব্যাংকটি তাদের বিরুদ্ধে মামলা করে। পাবনার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কৃষকের নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করলে তৎপর পুলিশ ১২ জন কৃষককে গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠায়। বাকি ২৫ জন কৃষক গ্রেপ্তারের ভয়ে বাড়িছেড়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, করোনাকালে কৃষক জীবনের ঝুঁকি নিয়ে জনগণের আহার জুগিয়েছে। সার-বীজ, কীটনাশক-সেচ, ডিজেল-বিদ্যুৎসহ কৃষি উপকরণের দাম দফায় দফায় বেড়ে কৃষকের উৎপাদন খরচ বেড়ে যাচ্ছে, কিন্তু উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে না। একই সাথে চাল-ডাল, তেল-নুন, পেঁয়াজ-ডিম, চিনি-তেলসহ নিত্যপণ্যের দাম ক্রমাগত বেড়ে মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে। গ্রামীণ কৃষক, খেতমজুর ও দিনমজুররা দুরবস্থার মধ্যে পড়েছে। সারা বছর তাদের কাজ থাকে না। তাদের ধারদেনা করে চলতে হয়। তাদের তিন বেলা খাবার জোটে না। দেশে একদিকে দেশের হাজার হাজার কোটি টাকা লুটপাট করে একদল মানুষ বিদেশে পাচার করছে আরেকদিকে মাত্র ১০-২০ হাজার টাকা কৃষি ঋণ পরিশোধ করতে না পারার কারণে ১ লাখ ৬৮ হাজার কৃষকের নামে সার্টিফিকেট মামলা ও হুলিয়া জারি করা হয়েছে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, এক দেশে দুই আইন চলতে পারে না। অবিলম্বে ঈশ্বরদীতে গ্রেপ্তারকৃত কৃষকের মুক্তি, হয়রানি বন্ধ ও সুদসহ ঋণ মওকুফের দাবি জানান।

ইরানের লড়াই মৌলবাদ-ফ্যাসিবাদ হটিয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার

অবশেষে ইরানের নারীদের দীর্ঘ দুই মাসের বেশি সময় ধরে চলা ধারাবাহিক আন্দোলনের একটা প্রাথমিক বিজয় অর্জিত হলো। দেশটির অ্যাটর্নি জেনারেল মোহাম্মদ জাফর মনতাজেরি বলেছেন, 'ইরানের বিচার বিভাগের সঙ্গে নীতি পুলিশের কোনো সম্পর্ক নেই। এটি বিলুপ্ত করা হচ্ছে।' যদিও ইরানের সরকারি সংবাদ মাধ্যম বলেছে 'নীতি পুলিশসহ বিভিন্ন বাহিনী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দেখে। এটি বিচার বিভাগ দেখে না'। কিন্তু রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইনি প্রশাসক যখন একথা বলতে বাধ্য হয় তখন এটা নিশ্চয়ই বোঝা যায় যে, এই আন্দোলন গোটা ইরানজুড়ে এক পরিবর্তনের আভাস দিচ্ছে।

ইরানের বৃহত্তম শহর, তেহরানে, মাসা আমিনি নামের একজন বাইশ বছর বয়সী কুর্দি নারীকে, ইরানের 'নৈতিকতা পুলিশ' হিজাব যথাযথভাবে না-পরার অভিযোগে গ্রেপ্তার করেছিল। পুলিশ হেফাজতে তাকে মারধর করা হয় এবং তিন দিন পর, সে মারা যায়। ইরানের জনগণ, বিশেষ করে তরুণ ইরানি নারীরা দ্রুতই এর প্রতিবাদ জানায়। কিন্তু প্রথমে যাকে প্রতিবাদ হিসেবে দেখা হয়েছিল তা একটা স্ফুলিঙ্গের মতো গোটা ইরানে ছড়িয়ে পড়েছে, যা দেশটি চল্লিশ বছরেরও বেশি সময় দেখেনি। নারীরা তাদের দাবিতে সামনের সারিতে বুক চিতিয়ে লড়াই করছে।

ইরানের বেশিরভাগ আন্দোলনের অগ্রভাগে নারীরা থাকেন, তবে এই প্রথমবারের মতো লিঙ্গ সহিংসতা এবং বৈষম্য বন্ধ করাসহ নারীদের দাবি নিয়ে আন্দোলন গোটা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। নারী নিপীড়নের বিরুদ্ধে কয়েক দশক ধরে চলা সংগ্রামের অংশ হিসেবেই সমানাধিকারের দাবিতে এই বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে। এই আন্দোলন শুধুমাত্র হিজাব সঠিকভাবে না পরার জন্য ইরানের সরকার কর্তৃক একজন তরুণীকে হত্যার প্রতিবাদ করার জন্য নয়; বরং এটি ইরানে কয়েক দশক ধরে চলা লৈঙ্গিক নিপীড়ন এবং মিসজিনিস্ট নীতির চূড়ান্ত পরিণতি, যা দ্রুত একটা বৈপ্লবিক পরিণতি নিচ্ছে।

১৯৭৯ সালের সামরিক শাসক রেজা শাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলছিল, তাতে যুক্ত ছিল ইরানের কমিউনিস্ট পার্টিসহ বিভিন্ন বামপন্থি শক্তিসমূহও। কিন্তু আন্দোলনের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে সহিংসতা এবং বর্বরতার মাধ্যমে আয়াতুল্লাহ খোমেনির নেতৃত্বে মোল্লাতন্ত্র ক্ষমতা দখল করেছিল। যাকে কথিত ইসলামি বিপ্লব হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। সে সময় হত্যা করা হয় বহু কমিউনিস্ট ও বামপন্থি নেতা-কর্মীকে। এরপর থেকেই নেমে আসে গোটা ইরানজুড়ে অবর্ণনীয় দমন-পীড়ন ও নির্যাতন। আয়াতুল্লাহ খোমেনি হিজাব কোডকে বাধ্যতামূলক ঘোষণা করেন, নারীদের চুল ও শরীর ঢেকে রাখতে বাধ্য করেন। মোল্লারা চূড়ান্ত নারী অধিকার বিরোধী শরিয়াহ আইন অনুমোদন করে। বিষয়টি দণ্ডবিধির ৬৩৮ নম্বর অনুচ্ছেদ হিসেবে যুক্ত করা হয়। ১৯৮৩ সাল থেকে নিয়মের লঙ্ঘনে তিন ধরনের শাস্তিও ঠিক হয়, দুই মাস পর্যন্ত কারাদণ্ড বা ৫ লাখ রিয়াল পর্যন্ত জরিমানা অথবা ৭৪টি পর্যন্ত বেত্রাঘাত। নিয়ম মানানোর জন্য ২০০৪ সালের পর থেকে বিশেষ বাহিনীও প্রস্তুত হয়, ইরানে যা 'গশতে এরশাদ' নামে পরিচিত। 'গশতে এরশাদ' নিয়মিত রাস্তাঘাটে টহল দেয়। এ রকম 'তদারকি টহল' দল 'বে-ঠিক' পোশাক-আশাকের জন্য নিয়মিত অনেককে আটকও করে। আটককৃতদের যেখানে নেওয়া হয়, তার দাপ্তরিক নাম 'এডুকেশন সেন্টার'। সেখানে কিছু বাধ্যতামূলক বক্তৃতা শুনতে হয়। পরিবারকেও ডেকে আনা হয় অনুরূপ উপদেশ শোনার জন্য।

ইরানের নারীরা তাঁদের স্বাধীনতার উপর এই আক্রমণ সহজে মেনে নেয়নি। ১৯৭৯ সালের ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবসে, কথিত বিপ্লবের কয়েক সপ্তাহ পরেই হাজার হাজার নারী তাদের

স্বাধীনতার উপর এই আক্রমণের বিরুদ্ধে এবং নতুন ধরণের লৈঙ্গিক নিপীড়ন এবং শরিয়াহ আইনের বিরুদ্ধে বিশাল বিক্ষোভের আয়োজন করেছিল। তাদের প্রধান স্লোগান ছিল 'যে বিপ্লব আমাদের পিছিয়ে দেয়, তা আমরা চাই না' এবং 'সমতা, সমতা, চাদরও না, মাথার স্কার্ফও না'। এই বিক্ষোভকে নির্মমভাবে দমন করা হয়।

১৯৭৯ সালে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল এবং বর্তমানেও ইরানে ছড়িয়ে পড়ে। বিক্ষোভে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে তা কেবল বাধ্যতামূলক হিজাব পরিধানের আইনের বিরুদ্ধে একটি

আন্দোলন নয়। প্রকৃতপক্ষে, ১৯৭৯ সালের কথিত ইসলামি বিপ্লবের পরে, ইরানি সমাজে নারীদের ভূমিকা ক্রমেই সীমিত হয়ে আসছিল। বিভিন্ন সময়ে ঐতিহাসিক আন্দোলনের মাধ্যমে নারীদের অর্জিত অনেক অধিকার হরণ করে এখন কথিত ইসলামপন্থি নেতারা নারী-পুরুষের বিভাজন সফলভাবে বাস্তবায়ন করেছে। ইসলামিক প্রজাতন্ত্রের শুরু থেকে, রাষ্ট্র হিজাব কোড এবং ইসলামি আইনগুলিকে মূল্যবান সামাজিক রীতিনীতি ও আচরণ হিসাবে প্রচার করে আসছিল। আর এই কাজে গণমাধ্যম, শিক্ষা ব্যবস্থা, রাষ্ট্রীয় নীতি এবং আইনি ব্যবস্থাসহ সকল সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে তারা ব্যবহার করেছিল।

'নৈতিকতা পুলিশ' হচ্ছে এমনই একটা প্রতিষ্ঠান যা নারীকে নিপীড়নের জন্য রাষ্ট্র তৈরি করেছিল। এরা স্ট্রিট গাইডেন্স টহল নিয়মিতভাবে দিয়ে পাবলিক জায়গায় ঘোরাফেরারত নারীরা যেন হিজাব কোড পালন করে তার তদারকি করে এবং প্রসাধনী ব্যবহারে সক্রিয়ভাবে নিরুৎসাহিত করে। প্রায় সমস্ত সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং সকল পাবলিক বা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে এধরণের নৈতিকতা রক্ষাকারীরা বিদ্যমান, যারা শুধুমাত্র মহিলাদের পোশাক কোডই নয়, বরং শরিয়াহ অনুযায়ী নারী এবং পুরুষদের আচরণও দেখভাল করে!

ইরানে কয়েক দশক ধরে চলা এই লৈঙ্গিক নিপীড়ন এবং পুরুষতান্ত্রিক নীতির ফল নারীর জীবনের প্রতিটি দিককে স্পর্শ করেছে। নিয়ম করে সকল পাবলিক জায়গায় স্কুল, পাবলিক ট্রান্সপোর্ট, বিশ্ববিদ্যালয়, বিনোদনের স্থান এবং কর্মক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্যমূলক বিধান প্রয়োগ করা হয়েছে। ফলে, নারীদের আরও বেশি প্রান্তিক অবস্থায় ঠেলে দেওয়া হয়েছে। তাদের কাজ এবং শিক্ষাগত অবস্থা আরও অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। কথিত ইসলামি বিপ্লবের পর কয়েক দশক ধরে, নারীদের নিয়মিতভাবে তাদের পোশাক, আচরণ এবং জীবনযাপনের ধরণের কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা কর্মস্থল থেকে বহিষ্কার করা হচ্ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে কী ধরণের বিষয় নারীরা পড়বে এবং কোন ধরণের চাকরি করবে সেগুলোও নিয়ম করে দেয়া হয়েছিল। নির্ধারিত ধরণের বাইরে অন্যান্য ক্ষেত্রে তাঁদের বাধা দেয়া হচ্ছিল।

১৯৮০ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নারী শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি বেড়েছে। তবে উচ্চশিক্ষিত নাগরিক হিসেবে কর্মক্ষেত্রে নারীদের জন্য বাড়তি সুযোগের সৃষ্টি হয়নি বরং তা কমেছে। ইসলামি বিপ্লবের আগে, ১৯৭৬ সালে, মহিলাদের স্বাক্ষরতার হার ছিল ৩৫%, যেখানে শ্রমশক্তিতে তাদের অংশগ্রহণ ছিল ১২.৯%। ১৯৮৬ সালে ইরানে মাত্র ৮.২% নারী কাজের সাথে যুক্ত ছিলেন, যখন স্বাক্ষরতার হার ছিল ৫২%। সাম্প্রতিক সময়ে ২০১৬ সালে শ্রমশক্তিতে নারীদের অংশগ্রহণ ছিল ১৪.৯% যদিও স্বাক্ষরতার হার ছিল তখন ৮২.৫%। কয়েক দশক ধরে শিক্ষাক্ষেত্রে নারীদের চিত্তাকর্ষক অগ্রগতি সত্ত্বেও, ইরানের বেশিরভাগ দরিদ্র জনগণই নারী, যারা শরিয়াহ আইনের অধীনে, অর্থনৈতিকভাবে পুরুষদের উপর নির্ভরশীল। এভাবেই দশকের পর দশক ধরে ইরানের নারীরা যেসব অন্যায়-অবিচারের মুখোমুখি হয়েছেন তার মধ্যে দারিদ্র্যতা ও অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা একটি বড় বিষয়। ইরানের বর্তমান বিক্ষোভের পেছনে এটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রেক্ষাপট। আবার জনসমাজে হিজাব বা প্যান্ট নিয়ে কঠোরতা কমার পক্ষে মতামত বাড়ছে। ইরানের পার্লামেন্টারি রিসার্চ সেন্টার (পিআরসি)-২০১৮-এর ২৮ জুলাই এ বিষয়ে তাদের ৩৯ পৃষ্ঠার এক জরিপ প্রতিবেদন প্রকাশ করে। তাতে দেখা যায়, মাত্র ৩৫ শতাংশ মানুষ এখন সরকারের 'ড্রেসকোড' কঠোরভাবে পালনের পক্ষে। ১৯৮৬ সালে এ সংখ্যা ছিল ৮৬ শতাংশ।

'ড্রেসকোড' নিয়ে ধারাবাহিক টানাপোড়েনের ভেতরই মাশার মৃত্যু হয়। এ ঘটনার প্রতিবাদে তীব্র ক্ষোভ থেকে বোঝা যাচ্ছে বিষয়টি নিয়ে সরকারের ভূমিকায় জনসমাজে অসন্তোষ জমাট বেধে ছিল। সেই অসন্তোষ বাড়ে যখন বর্তমান প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি 'ড্রেসকোড' লঙ্ঘন শনাক্ত করতে মুখাবয়ব শনাক্তকারী অত্যাধুনিক নজরদারি ক্যামেরা বসানোসহ আরও কিছু নির্দেশ দেন এবছরের ১৫ আগস্ট। ৫ সেপ্টেম্বর '২২ আরব নিউজ, গার্ডিয়ানসহ বহু আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে এ নিয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এ সময় থেকে হিজাবের বিরুদ্ধে কোনো অভিমত দেওয়াকেও শাস্তিযোগ্য করা হয়। রাইসির এ ঘোষণায় নারীদের গ্রেপ্তার বাড়ার শঙ্কা তৈরি করে।

শরিয়াহ আইন নিয়ন্ত্রিত পরিবার ও বিবাহব্যবস্থা ক্রমেই নারীর জীবনকে বিষিয়ে তুলেছিল। বিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ এবং সন্তানদের হেফাজতে নারীদের অধিকার সংকুচিত করা হয়। সন্তানের জন্মসনদে শিশুর বাবার নাম থাকে, তাদের মায়ের নাম বাদ দেওয়া হয়। যার ফলে তাদের নিজের সন্তানদের উপর নারীদের আর আইনগত অধিকার থাকে না। বাল্য বিবাহ বৈধ করা হয়। একজন নারীর চাকরির পছন্দ, থাকার জায়গা বা দেশ ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপে তার স্বামীর অনুমতির উপর নির্ভর করে। বহুবিবাহকে বৈধ এবং উৎসাহিত করা হয়েছিল এবং কোন নারীকে যদি তার স্বামী ব্যতীত অন্য কোনও পুরুষের সাথে থাকতে দেখা যায় তার জন্য মৃত্যুদণ্ডের বিধান করা হয়েছিল। মৌলবাদী শাসকেরা মেয়েদের বিয়ের বয়স ধার্য করেছিল ৯ বছর। জনগণের প্রবল প্রতিবাদের সামনে পড়ে ২০০২ সালে পার্লামেন্ট মেয়েদের বিয়ের বয়স বাড়িয়ে করে ১৩ বছর। সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রেও রয়েছে ব্যাপক বৈষম্য। স্বামী মারা গেলে তার সম্পত্তিতে স্ত্রীর অধিকার নগণ্য, মাত্র সাড়ে ১২ শতাংশ, কিন্তু স্ত্রী মারা গেলে, তার সম্পত্তি পুরোটাই পাবে স্বামী। পৈত্রিক সম্পত্তিতে মেয়ের ভাগ ছেলেদের অর্ধেক। বিচারবিভাগে মেয়েদের চাকরির কোনও অধিকার নেই রাষ্ট্রপতি নির্বাচনেও মেয়েদের দাঁড়ানো নিষিদ্ধ। এমন কথাও শাসকদের পক্ষ থেকে প্রচার করা হয় মহিলাদের মস্তিষ্কের শক্তি পুরুষের অর্ধেক।

১৯৭৯ সালে মোল্লাতন্ত্র জেঁকে বসার পর থেকে, আইনগতভাবে এবং আনুষ্ঠানিকভাবে নারীদেরকে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকে পরিণত করা হয়েছে। তবে যে নারীরা শাসকদের পরিবারের অন্তর্গত এবং এই ধরণের পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্যে বিশ্বাস করে তারা নানা সুবিধা পায়। যেমন, কিছু সরকারি পদে তাঁদের আসীন করা হলো। বিপরীতে ইরানের শ্রমজীবী নারীদের অবস্থা ক্রমাগত আরও নাজুক হচ্ছিল। নারীরা বিশেষ করে শ্রমজীবী নারী এবং জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু নারীরা কথিত ইসলামি শাসনে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

ইরানি নারীরা এসকল পরিস্থিতি কখনোই নীরবে মেনে নেননি। প্রথম থেকেই গত ৪ দশক ধরে নারীরা নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য ও গোপনে নানা প্রতিবাদ করে আসছিল। কয়েক বছর আগে, ইংহেলাব স্ট্রিটের মেয়েরা ইরানে বাধ্যতামূলক হিজাবের বিরুদ্ধে রাস্তায় তাদের মাথার স্কার্ফ সরিয়ে প্রতিবাদ করেছিল। ইরানের রাস্তায় নারীদের এবং বিশেষ করে তরুণীদের, সাম্প্রতিক সময়ে মাথার স্কার্ফ অপসারণ এবং পুড়িয়ে ফেলা এর আগের বিক্ষোভেরই ধারাবাহিকতা।

বর্তমান আন্দোলনের মূল স্লোগান, 'নারী, জীবন, স্বাধীনতা'। এই স্লোগান উদ্ভূত হয়েছে, স্বাধীনতা সংগ্রামরত কুরস্ক এবং সিরিয়ার কুর্দি নারীদের মধ্য থেকে। সেখানে কয়েক দশক ধরে জাতিগত বৈষম্য এবং পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে

এরপর পৃষ্ঠা ১২ কলাম ১

ইরানের লড়াই মৌলবাদ-ফ্যাসিবাদ হটিয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার

১১ পৃষ্ঠার পর

লড়াইয়ের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে, একই সাথে তারা লড়ছে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন, অত্যাচার এবং মৌলবাদী সন্ত্রাসী আইসিস এর বিরুদ্ধে। ইরানি নারীদের এই আন্দোলনের বার্তা ছড়িয়ে পড়েছে ইরানের বাইরেও বিভিন্ন দেশে। আন্দোলনের প্রথম সারিতে থাকা ইরানি নারীরা শুধু তাদের নিজেদের নিপীড়নের দিকেই নয়, আফগান নারীদের প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। মধ্যপ্রাচ্য এবং গোটা দুনিয়াজুড়েও নারীরা ইরানি নারীদের লড়াইয়ের সাথে সমর্থন ও সংহতি জানিয়ে রাস্তায় এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সরব আছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী দেশ নানাভাবে এই আন্দোলনে সমর্থন ব্যক্ত করে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের চেষ্টা করছে। কিন্তু ইরানের নারীরা দেশের মোল্লতন্ত্রের বিরুদ্ধে যেমন সোচ্চার একই সাথে তারা এই সাম্রাজ্যবাদী দুরভিসন্ধি সম্পর্কেও সচেতন রয়েছে। কেননা এই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার নিজের দেশেও নারীদের দীর্ঘদিনের অর্জিত অধিকারসমূহকে নানাভাবে সংকুচিত করছে। সম্প্রতি নারীদের গর্ভপাতের অধিকারকেও সেখানে খর্বকরা হয়েছে। তাছাড়া নারীকে পণ্যে পরিণত করা, নারী শরীরকে যৌনবস্তু হিসেবে ব্যবহার করা ইত্যাদিকে তারা নিয়মসিদ্ধ করে ফেলেছে। অর্থাৎ একদিকে মোল্লাতন্ত্র যেমন নারীকে খোলসবন্দি করে কূপমণ্ডুক করে রাখতে চায় আবার অন্যদিকে পুঁজিতন্ত্র নারীকে পণ্য করে মুনাফা অর্জনের উপায় হিসেবে ব্যবহার করতে চায়। এই উভয়ের বিরুদ্ধে নারীকে তার মর্যাদা ও সমতার অধিকার নিয়ে লড়তে হবে।

গত কয়েক দশকে ইরানে নানা ইস্যুতেই অনেক প্রতিবাদ হয়েছে। ইরানি সমাজ বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইরানের শাসকগোষ্ঠীর অদক্ষতা উন্মোচিত হয়েছে। এর ফলে আমরা দেখি ইরানে এখন প্রতি তিনজনের একজন ইরানি দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। এ বছরের জানুয়ারিতে প্রকাশিত সরকারি হিসাবে আগের ১২ মাসে জিনিসপত্র এবং বিভিন্ন সেবায় খরচ বেড়েছে ৪২ শতাংশ। জুনে এটা ৫৪ শতাংশে হয়েছে। ভয়াবহ করোনা পরিস্থিতির পর ইরানিরা এখন জিনিসপত্রের উচ্চমূল্যের মহামারিতে আছে। জার্মান সংবাদপত্র 'আনজেরে জাইট'কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ইরানের বামপন্থি দল 'তুদে পার্টি'র আন্তর্জাতিক মুখপাত্র মহম্মদ ওমিদভার জানাচ্ছেন, সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী ইরানে ৪০ শতাংশের বেশি জনগণ দরিদ্র্যসীমার নিচে, বেকারত্ব ভয়াবহ, কোনও কোনও প্রদেশে তা ৭০ শতাংশের বেশি। এর সঙ্গে জুড়ে আছে শাসকদের সীমাহীন দুর্নীতি। সৌদি আরবের শাসকরা এবং আফগানিস্তানের তালেবানরা মহিলাদের উপর যে ধরনের ফতোয়া জারি করেছে, ইরানেও তাই, এমনকী তার নিজের শরীরের উপর নিজের অধিরকারটুকুও নেই। আবার অন্যদিকে অগণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাও জনগণের উপর চেপে বসে আছে। বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় নীতিতে জনগণের মতামত বা অংশগ্রহণ থাকে না বললেই চলে। রাজনীতি ও অর্থনীতি দুই দিকের চাপে নাগরিকদের হতাশা টের পাওয়া গিয়েছিল গত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে। তারা আর ভোট দিতে উৎসাহ দেখাচ্ছে না। অর্ধেকের বেশি মানুষ (৫২ শতাংশ) গত নির্বাচনে ভোট দিতে আসেনি। আগের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের চেয়ে সর্বশেষটায় ভোটার কমেছে ২৫ শতাংশ। অথচ বিপ্লবের পর গণভোটে ইরানে ৯৮ শতাংশ ভোট পড়েছিল। ভোটের প্রতি গণ-অনীহার এক কারণ নির্বাচনের মনোনয়ন প্রক্রিয়া। সমাজের নেতৃত্ব পর্যায়ে এমন অনেকে আছেন, যারা সংস্কারের পক্ষে এবং ভোটে প্রদিদ্বন্দ্বিতার যোগ্য। কিন্তু মনোনয়ন প্রক্রিয়া এত নিয়ন্ত্রিত যে তাতে উদারপন্থি কারও প্রার্থী হওয়ার সুযোগ কম। সর্বোচ্চ নেতা হিসেবে খোমেনিই সেনাপতি নিয়োগসহ বিভিন্ন নীতিগত বিষয়ে একক সিদ্ধান্ত নেন। যা নিয়ে কোন প্রশ্নও করা যায় না। এই দমবন্ধ অবস্থার কারণেই সেখানে মাঝে মাঝেই সহিংস বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয় আর যা দমন করা হয় নৃশংস কায়দায়। ২০১৯ সালেও জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে বিক্ষোভে প্রায় ১৫০০ ইরানি জনগণকে হত্যা করা হয়েছিল।

এর আগে ২০১৭ সালেও মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিল। সরকার, পার্লামেন্ট থেকে শুরু করে বিচারবিভাগ, ন্যাশনাল গার্ড এবং সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা, যাদের মূল কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে বৃহৎ পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষা, তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিল। বিভিন্ন শিল্পক্ষেত্রে অসংখ্য শ্রমিক ধর্মঘট হয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হাফট টাপে আখভিত্তিক কৃষিশিল্প কমপেক্স, আরকের হেভি ইক্যুইপমেন্ট প্রোডাকশন, পেট্রোলিয়াম শিল্পের ধর্মঘট, শিক্ষক ধর্মঘট, পেনশনার্সদের ধর্মঘট। ২০১৭-এর আন্দোলন নানা দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ—এই আন্দোলন সরাসরি আঙুল তুলেছে পুঁজিবাদ সৃষ্ট দারিদ্র্য এবং প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে দাবি ছিল ধর্মীয় প্রজাতন্ত্র নিপাত যাক, সুপ্রিম শাসক খোমেনির মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে, প্রেসিডেন্ট রৌহানির মৃত্যুদণ্ড চাই এবং তথাকথিত রেভুলিউশনারি গার্ডদের মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও নার্সরা আন্দোলনে ফেটে পড়েছে। কারণ, ব্যাংক দেউলিয়া হয়ে যাওয়ার জন্য তাদের কষ্টার্জিত স্বল্প সঞ্চয়ও হারাতে হয়েছিল। সব মিলে ইরান আগে থেকেই ছিল একটা বিক্ষোভের আগ্নেয়গিরি।

ইরানের শাসকেরা যেকোন প্রতিবাদকেই ধারাবাহিকভাবে সহিংস কায়দায় দমন করেছে। ইরানি জনগণের সম্মিলিত স্মৃতি নিপীড়ন ও অপমানে পূর্ণ। ইরানের চলমান এই আন্দোলনকে দমন করার জন্যও তারা নৃশংস কায়দায় মানুষ হত্যা করার পথ বেছে নিয়েছে। এর মধ্যেই ইরান সরকার প্রায় ৪০০ জনকে হত্যা করেছে, যাদের মধ্যে প্রায় ৫০ জন শিশু। সরকারিভাবেই বলা হয়েছে প্রায় ২০০ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। গ্রেপ্তার করা হয়েছে ১৬ হাজার ৮০০ জনকে। সম্প্রতি এক বিক্ষোভকারীকে বিক্ষোভের অপরাধে ফাঁসি দেয়া হয়েছে। জাহেদান অঞ্চলে বেলুচ জনগোষ্ঠীর মসজিদে বোমা মেরে প্রার্থনারত প্রায় ৯৫ জন মানুষকে হত্যা করা হয়েছে গত সেপ্টেম্বরের ৩০ তারিখ। ইরানের ৩১টি প্রদেশের ৩০টি প্রদেশেই বিক্ষোভ চলছে। রাষ্ট্রের এই সহিংস সন্ত্রাসী তৎপরতা যত বাড়ছে তার একটা বিপরীত প্রভাবও লক্ষ্য করা যাচ্ছে তা হলো—ইরানি বিপ্লব ছড়িয়ে পড়ছে।

'এটি একটি নারী বিপ্লব, পুরো ব্যবস্থাটি লক্ষ্য' এবং 'এটিকে প্রতিবাদ বলবেন না, এটিকে একটি বিপ্লব' এধরনের স্লোগানগুলি শুধু নারী অধিকার নয় বৃহত্তর সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করে। ইরানের এই আন্দোলন লিঙ্গ, জাতীয়তা ও ধর্মের সীমানা অতিক্রম করে আরও বৃহত্তর সামাজিক আন্দোলনের রূপ নিচ্ছে। মাশা আমিনিকে নিয়ে এই আন্দোলনের সূত্রপাত হলেও সম্প্রতি ইরানের সবচেয়ে পিছিয়ে থাকা বেলুচ নারীরাও এই আন্দোলনে যুক্ত হওয়ার কথা জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছে। যারা ব্যাপক সংখ্যায় আন্দোলনে যোগ দিচ্ছেন তাদের মধ্যে রয়েছে তরুণরা, বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, এছাড়াও শিল্পী, অভিনেতা-অভিনেত্রী, ক্রীড়াবিদ, সাংবাদিক বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষ। একটি সমতার সমাজ প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে নিজেদে সংহতি জানিয়ে বিশ্বকাপ ফুটবল খেলায় অংশ নেয়া ইরানের ফুটবল দল তাঁদের ম্যাচ শুরুর সময় জাতীয় সঙ্গীতে কণ্ঠ না মিলিয়ে প্রতিবাদ করার এক অনন্য নজির স্থাপন করেছে। গ্যালারিতে ইরানের জনগণ রাষ্ট্রের দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে পোস্টার তুলে ধরেছে।

ইরানের অর্থনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা বেশ কিছু শ্রমিকেরা আন্দোলনকে সমর্থন করে ধর্মঘটের ডাক দিচ্ছে। শিক্ষক ও শ্রমিক ইউনিয়নগুলো আন্দোলনের পক্ষে রাস্তায় নেমেছে। সাম্প্রতিককালে আসালুয়ে এবং আবাদান পেট্রোকেমিক্যালের প্রমিকদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আসলে নৈতিকতা পুলিশ কর্তৃক মাশা আমিনীর হত্যাকাণ্ডটি ছিল এক স্ফুলিঙ্গ যা কয়েক দশক ধরে পুঞ্জীভূত ক্ষোভের আগুনকে বিস্ফোরণে পরিণত করেছে।

ইরানের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর সমর্থন ও সক্রিয়তাই এই আন্দোলনের শক্তি। এই আন্দোলন ইরান ও মধ্যপ্রাচ্যের বৈষম্য ও প্রতিক্রিয়ার সমগ্র কাঠামোকে উন্মোচিত করেছে এবং তা পরিবর্তনের লক্ষ্য ঘোষণা করেছে। এর মানে এই নয় যে, আমরা শীঘ্রই এর বিপ্লবাত্মক ফলাফল দেখতে পাব; সমাজে এখনও অনেক মানুষ আছে যারা স্বাধীনতার স্লোগান ও আন্দোলন নিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত। এর মানে এই নয় যে, আন্দোলনবিরোধী দলগুলো সক্রিয় নয়, তারা আন্দোলনকে নস্যাৎ করতে পারে, ইরানের মোল্লাতন্ত্র এই আন্দোলনকে কঠোর এবং নৃশংসভাবে দমন করতে পারে। সমস্ত বাস্তব হুমকি এবং শর্তসহ একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে ইরানসহ গোটা মধ্যপ্রাচ্যের অন্ধকার যুগের অবসানের শুরু মনে হয় আমরা দেখতে পাচ্ছি।

লুটপাট থেকে লোপাটের গল্প

সত্য নাকি বিস্ময়ের চেয়েও শক্তিশালী। তাই কিছু কিছু বিষয় যেন বিস্ময়কেও হার মানায়। যেমন, সাধারণ মানুষ ধারণা করতে পারবেন, তিরিশ হাজার কোটি টাকা মানে কত টাকা? মাসে যদি কেউ এক লাখ টাকা করে সঞ্চয় করেন তাহলে এক কোটি টাকা সঞ্চয় করতে লাগবে ৮ বছর। এক লাখ টাকা আয় করতে পারেন এরকম মানুষ কতজন আছে দেশে আর এক লাখ টাকা মাসে সঞ্চয় করতে পারেন এরকম আয়ের মানুষ কতজন? তারপরও যদি তাঁরা সঞ্চয় করতে থাকেন তাহলে ব্যাংকের মুনাফা পেয়ে কমপক্ষে ২ লাখ বছর লাগবে তিরিশ হাজার কোটি টাকা ব্যাংকে জমাতে। আর তিরিশ হাজার কোটি টাকা ঋণ নিয়ে গেল ব্যাংক থেকে তেমন কোন কাগজপত্র না দেখিয়ে বা ভুয়া কাগজপত্র দেখিয়ে! এও সম্ভব?

এই টাকা জনগনের জন্য ব্যয় করা হলে বিদ্যুতের দাম বাড়িয়ে ৮ হাজার কোটি টাকার বাড়তি বোঝা জনগনের কাধে চাপানো, সারের দাম বাড়ানো, তেলের দাম বাড়ানোর প্রয়োজন হতো না। আর ডলারের অঙ্কে এর পরিমাণ প্রায় তিন বিলিয়ন ডলার। সাড়ে তিন বছরে অর্থাৎ ৪২ মাসে সাড়ে চার বিলিয়ন ডলার ঋণের জন্য আইএমএফ এর প্রতিনিধি দলের কতই না জবাবদিহি আর শর্ত আমরা দেখলাম। আবার পদ্মা সেতু নিয়ে আবেগ অহংকার, গর্ব শাসক দল ও তাদের সমর্থক এবং পদ্মা পাড়ের জনগণের সেটাও আমরা লক্ষ্য করেছি। সেই সময়েই খবর এলো এস আলম গ্রুপ নাকি ইসলামি ব্যাংক থেকে তিরিশ হাজার কোটি টাকা নিয়ে গিয়েছে। এস আলমের এই টাকা প্রায় পদ্মা সেতু নির্মাণের মোট খরচের সমান। পদ্মা সেতু করা নিয়ে শাসক দল ও তার সমর্থকদের যত আনন্দ-উল্লাস কিন্তু সেই একই পরিমাণ অর্থের লুটপাট নিয়ে কোন দুঃখ-বেদনা, লজ্জা-গ্লানি নেই! কেন এমন হলো বা হচ্ছে?

ব্যাংক থেকে টাকা নিয়ে ফেরত না দেওয়া বাংলাদেশে কি খুব সহজ? একের পর এক ঘটনায় প্রমাণিত হচ্ছে যে, ব্যাংক থেকে ঋণের নামে টাকা বের করে নেওয়ার পদ্ধতি খুবই সহজ। এজন্য প্রথম কাজ হলো ক্ষমতার সঙ্গে থাকা। রাজনৈতিক সম্পর্ক ব্যবহার করার দক্ষতা লাগবে। সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের মালিক পক্ষ ও ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জড়িতদের সঙ্গে নিবিড় সংযোগ রক্ষা করে ভুয়া ঠিকানায় কাগুজে প্রতিষ্ঠান তৈরি করে ঋণ নেওয়া। এ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সম্পর্কগুলো যত প্রভাবশালী হবে নিয়ন্ত্রক সংস্থা ততই চুপচাপ থ াকবে। নিশ্চয়ই মনে আছে কীভাবে প্রশান্ত কুমার (পি কে) হালদার নামে-বেনামে অনেকগুলো কোম্পানি খুলে তারপরই দখল করেছিলেন একাধিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান। প্রশান্ত হালদার কিন্তু এই পদ্ধতির জনক ছিলেন না। তিনি শিখেছিলেন আরেক বড় ব্যবসায়ী গ্রুপের প্রধানের কাছ থেকে। আবার ব্যবসায়ী গ্রুপের সেই প্রধান শিখেছিলেন দেশের ব্যবসায়ী নেতার কাছ থেকে। এ পদ্ধতিতে কোম্পানি খুলে শেয়ারবাজার থেকে অর্থ তুলে নেওয়া হয়েছে অতীতে।

একসময় দেখা যেত ব্যবসায়ীরা নিজের কোম্পানির নামে ব্যাংক থেকে ইচ্ছেমতো ঋণ নিতেন। তাতে কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানের কাছে বিপুল পরিমাণ ঋণ চলে যেত। কোনো একক প্রতিষ্ঠানের কাছে যাতে বেশি ঋণ চলে না যায়, এজন্য ঋণ নেওয়ার সীমা আরোপ করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। কিন্তু সহজে টাকা পাওয়ার জন্য ব্যাংক থেকে ঋণ তো নিতেই হবে। তাই শুরু হয় অন্যের নামে, ভুয়া নাম-ঠিকানা ব্যবহার করে সরকারি ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়া।

আবার অনেকে কোম্পানি না খুলে শুধু ট্রেডিং লাইসেন্স নিয়েই ব্যবসা করছেন। ব্যাংক থেকে তুলে নিচ্ছেন টাকা এবং সেই টাকা ব্যাংকে ফেরতও দিচ্ছেন না। এমন প্রথা বেশ পুরনো এবং চলেছে বহু দিন। সাবেক ওরিয়েন্টাল ব্যাংকও প্রায় ধ্বংসের পথে গিয়েছিল এসব কারণেই। একেকটা ঘটনা ঘটে আলোড়ন তৈরি হয়, প্রশ্ন ওঠে, কেন ভুয়া নাম ও ঠিকানা ব্যবহার করে ঋণ নেওয়া বন্ধ হচ্ছে না। কমছে না খেলাপি ঋণের পরিমাণ আর এসব দেখার এবং ঠেকানোর দায়িত্ব কার? অভিজ্ঞতা থেকে ব্যাংক খাত-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলেন, যখন ব্যাংকের মালিক পক্ষ ভুয়া কোম্পানির নামে ব্যাংক থেকে টাকা নিয়ে যায়, তখন তা ঠেকানো কঠিন। কারণ, ব্যাংক কর্মকর্তারা চাকরি হারানোর ভয়ে মালিকের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করতে পারে না। এ ক্ষেত্রে একমাত্র ভরসা কেন্দ্রীয় ব্যাংক। যদি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের যথাযথ নজরদারি ও সদিচ্ছা থাকে, তাহলেই আমানতকারীদের অর্থের সুরক্ষা দেওয়া সম্ভব। তবে কি এখন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নজরদারি কম? যে কারণে আমানতকারীদের অর্থের সুরক্ষা সেভাবে দেওয়া যাচ্ছে না।

২০১১ সালে ব্যাপক আলোচনায় এসেছিল হলমার্ক কেলেঙ্কারি। কেলেঙ্কারির দায় না নিয়ে সমালোচনার জবাব দিতে গিয়ে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী বলেছিলেন, বাংলাদেশের অর্থনীতির বিবেচনায় ৪ হাজার কোটি টাকা কিছুই নয়। সে সময় দেখা গিয়েছিল হলমার্ক গ্রুপ সোনালী ব্যাংক থেকে

এরপর পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ১

সভা-সমাবেশ, মিছিলে বাধাদান করে ফ্যাসিবাদী সরকার নাগরিক অধিকার হরণ করছে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বাম জোটের কেন্দ্রীয় নেতা বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ)'র সাধারণ সম্পাদক বজলুর রশীদ ফিরোজ, বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগের সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য আব্দুস সাত্তার, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ (মার্কসবাদী)'র সমন্বয়ক মাসুদ রানা, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোশরেফা মিশু, সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের নির্বাহী সভাপতি আব্দুল আলী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনের লিখিত বক্তব্যে বলা হয় :

সভা-সমাবেশ-মিছিলে বাধাদান করে আওয়ামী ফ্যাসিবাদী সরকার নাগরিকদের সাংবিধানিক অধিকারকে ক্রামগত হরণ করে চলেছে। বর্তমান সরকারের দুঃশাসন ও লুটপাটের কারণে জাতীয় ও জনজীবনে সংকট সর্বগ্রাসী রূপ নিয়েছে। দেশের অর্থনীতির ভঙ্গুর চিত্র প্রতিদিনের সংবাদপত্রের খবরে প্রকাশ পাচ্ছে। সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় ব্যাংক ডাকাতেরা ঋণ নিয়ে ফেরৎ না দিয়ে বিদেশে পাচার করে ব্যাংকগুলো ফোকলা করে ফেলেছে। সিন্ডিকেট ব্যবসায়ীরা চাল-ডাল, তেল-চিনিসহ নিত্য পণ্যের দাম দফায় দফায় অস্বাভাবিক বৃদ্ধি করে বাজারে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করে জনদুর্ভোগ ক্রমাগত বাড়িয়ে তুলেছে। আর গণতন্ত্রহীনতা ও অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশে বিদেশি শক্তি ও দেশের অভ্যন্তরের অন্ধকারের শক্তিও মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে।

মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ আজ অসৎ রাজনীতিবিদ, সামরিক বেসামরিক আমলা, ব্যবসায়ী এবং টাকা পাচারকারী, ঋণখেলাপি, ব্যাংক ডাকাত ও বাজার সিন্ডিকেটের দখলে। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে মানুষ যখন উদগ্রীব হয়ে রাস্তায় নামছে তখন পুলিশ দিয়ে মানুষ খুন করে, গায়েবি মামলা দিয়ে গ্রেপ্তার, নির্যাতন নিপীড়ন করে দমন পীড়নের পথে ক্ষমতা আঁকড়ে থাকতে চাইছে, একই সাথে দলীয় সন্ত্রাসীদের দিয়ে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করছে। প্রতিনিয়ত মিথ্যা বক্তব্য গণমাধ্যমে প্রচার করছে যা মানুষ মোটেও বিশ্বাস করে না। রাজনৈতিক দলের সভা-সমাবেশ, মিছিল করার অধিকার দেশের সংবিধান দ্বারা সংরক্ষিত। কিন্তু শাসক সরকার জনগণের সকল সাংবিধানিক অধিকার হরণ করে দেশকে পুলিশি রাষ্ট্রে পরিণত করেছে। সভা-সমাবেশ করার জন্য পুলিশের অনুমতি নেয়ার অলিখিত বিধান কার্যকর করেছে। সম্প্রতি বিরোধী দল বিএনপির বিভাগীয় সমাবেশগুলো পণ্ড করতে বাস-ট্রাক, লঞ্চ, থ্রি হুইলার বন্ধ করে শুধু বিএনপির সমাবেশেই প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেনি, সাধারণ জনগণের চলাচলেও বাধা তৈরি করে অসুস্থ রোগীকে হাসপাতালে নেয়া, শিক্ষার্থীদের স্কুল-কলেজে যাওয়ায় বাধা সৃষ্টি করেছে। বাস্তবে ঐসব এলাকার জনগণকে জিম্মি করে রেখেছিল সরকার।

বিএনপির ঢাকা সমাবেশকে কেন্দ্র করে জনসভার স্থান নিয়ে সরকার বাকযুদ্ধে লিপ্ত হয়ে মূল সমস্যা থেকে জনগণের দৃষ্টি আড়াল করে দেশের সম্পদ লুণ্ঠন, ব্যাংক ডাকাতি, অর্থপাচার, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিসহ জনজীবনের সংকট নিরসনে সরকার তার ব্যর্থতা ঢাকার অপচেষ্টা করছে।

১০ ডিসেম্বর তারিখের সমাবেশকে ঘিরে গণগ্রেপ্তার ও গায়েবি মামলা দায়েরে জনমনে চরম উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা বিরাজ করছে। এহেন পরিস্থিতিতে পুলিশের বিএনপি কার্যালয়ে হামলা, গুলি করে হত্যা, নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করে রাজনৈতিক পরিস্থিতি যেমন আরও সংঘাতময় করে তুললো তেমনি এই ঘটনায় সরকারের ফ্যাসিবাদী চরিত্র আরেকবার উন্মোচিত হলো। পাল্টাপাল্টি বাকযুদ্ধের পরে জনসভার স্থান নিয়ে সমঝোতায় আসার খবর শুনে মানুষ যখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছিল তার পরেই গভীর রাতে মির্জা ফখরুলসহ নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তারের ঘটনায় পুনরায় জনমনে উৎকণ্ঠা বেড়ে গিয়েছে।

দেশে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা ও জনগণের জান-মালের নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব সরকারের। অথচ দলীয় নেতাকর্মীদের এক সভায় দেয়া প্রধানমন্ত্রীর 'যে হাত দিয়ে মারতে আসবে সে হাত ভেঙে দিতে হবে', 'যে হাত দিয়ে আগুন দিতে আসবে সে হাত আগুনে পুড়িয়ে দিতে হবে' এ ধরনের বক্তব্য সংঘাত সংঘর্ষকে উস্কে দেয়ার সামিল। এমনকি প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ ভঙ্গেরও শামিল। আমরা সরকারের সর্বোচ্চ দায়িত্বশীল অবস্থানে থেকে এহেন দায়িত্বহীন বক্তব্যেরও তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি।

বিএনপি মহাসচিবকে অফিসে ঢুকতে না দেয়ার কারণ হিসেবে পুলিশ যে যুক্তি উপস্থাপন করছে তা খুবই হাস্যকর। বলা হচ্ছে অফিসে বোমা মজুদ করে রাখা হয়েছে। পুলিশের একথা দেশের জনগণ মোটেই বিশ্বাস করে না, কারণ নিরীহ মানুষের পকেটে ফেনসিডিল, ইয়াবা ঢুকিয়ে দিয়ে মামলায় গ্রেপ্তার হয়রানি নাটক জনগণ অহরহ দেখে আসছে।

নয়াপল্টনে বিএনপির সমাবেশ করতে না দেয়ার কারণ হিসেবে যানজট, জনদুর্ভোগের উল্লেখ করা হচ্ছে। অথচ গত ৫ এবং ২০ নভেম্বর সরকারি দল আওয়ামী লীগ উত্তরা ও বাড্ডায় জনপথ ও প্রগতি স্মরণীতে রাস্তা বন্ধ করেই বড় সমাবেশ করে ব্যাপক জনদুর্ভোগ ও যানজট সৃষ্টি করলেও পুলিশ ও সরকারের চোখে তা পড়ে নাই। এমনকি আজও দুপুরে বায়তুল মোকাররম দক্ষিণ গেটে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগ রাস্তা বন্ধ করে মঞ্চ বানিয়ে জনসভা করবে, এতে যানজট ও জনদুর্ভোগ কি হবে না? তাই জনদুর্ভোগের কথা বলে বিরোধী রাজনৈতিক দলের সভা সমাবেশে বাঁধা দেয়া যে জনগণের প্রতি সরকার পুলিশের দরদ না বরং নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকারের স্পষ্ট লংঘন তা দেশবাসীর কাছে জলের মতো পরিষ্কার।

বিরোধী দলসমূহের প্রতি সরকারের এহেন আচরণ, বিভিন্ন স্থানে বাম জোটের সমাবেশে বাধা দান, নেত্রকোনায় সিপিবি সমাবেশে সরকার দলীয় সন্ত্রাসী ও পুলিশের হামলা, বিএনপির বিভাগীয় সমাবেশে বাস ট্রাক, লঞ্চ, ত্রি হুইলার বন্ধ করে বাধা সৃষ্টি এবং ১০ ডিসেম্বর বিএনপির ঢাকা বিভাগীয় সমাবেশকে কেন্দ্র করেও সরকার-পুলিশের ন্যাক্কারজনক ভূমিকা এবং যুদ্ধাংদেহী মনোভাব গোটা দেশের জনগণের মধ্যে চরম উদ্বেগ উৎকণ্ঠার সৃষ্টি করেছে।

আমরা অবিলম্বে সরকার ও পুলিশ কর্তৃক বিরোধী মত দমনের হীনপথ পরিবহার করে শান্তিপূর্ণভাবে রাজনৈতিক দলের সভা-সমাবেশ করতে দেয়ার জোর দাবি জানাচ্ছি। একই সাথে বিএনপি অফিসে হামলা, টিয়ার সেল নিক্ষেপ ও হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত দায়ী পুলিশের বিচার এবং মির্জা ফখরুলসহ গ্রেপ্তারকৃত নেতৃবৃন্দের মুক্তি, নিহতের পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ, আহতদের সুচিকিৎসা প্রদান এবং গণগ্রেপ্তার ও গায়েবি মামলা বন্ধের জোর দাবি জানাচ্ছি।

আমরা ২০১৪, ২০১৮ সালের নির্বাচনে নজীরবিহীন জালিয়াতি ও ভোট ডাকাতির দৃষ্টান্ত সৃষ্টিকারী শেখ হাসিনার সরকারকে অবিলম্বে পদত্যাগ করে, সংসদ ভেঙে দিয়ে সংখ্যানুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতিসহ নির্বাচন ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করে নির্দলীয় তদারকি সরকারের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচনের দাবি জানাচ্ছি। একই সাথে আওয়ামী ফ্যাসিবাদী সরকারকে উৎখাত করে জনগণের ভোট ও ভাতের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সকল বাম-গণতান্ত্রিক শক্তি ও ব্যক্তিকে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানাচ্ছি।

লুটপাট থেকে লোপাটের গল্প

১২ পৃষ্ঠার পর

টাকা আত্মসাৎ করতে যেসব কোম্পানির নাম ব্যবহার করে, তার কয়েকটি ছিল কাগজ নির্ভর। অর্থাৎ এসব কোম্পানির কোনো অস্তিত্ব ছিল না। এর ফলে সোনালী ব্যাংকের লোকসান হয় প্রায় তিন হাজার কোটি টাকা। যার পুরোটাই এখন খেলাপি। সোনালি ব্যাংক কি সেই ধাক্কা এখনো কাটিয়ে উঠতে পেরেছে?

এরপর খবর বের হয় ২০১৪-১৫ সালে অ্যানন টেক্স গ্রুপ জনতা ব্যাংক থেকে প্রায় সাড়ে ৫ হাজার কোটি টাকা ঋণের নামে নিয়ে গিয়েছে। এই পরিমাণ ঋণ নেওয়ার জন্য ২২টি প্রতিষ্ঠানের নাম ব্যবহার করে গ্রুপটি। পরে বাংলাদেশ ব্যাংকের তদন্ত কিংবা পরিদর্শনে দেখা যায়, এদের মধ্যে মাত্র চারটি কোম্পানি ছিল পূর্ণাঙ্গ। অনেকগুলোই কাগুজে। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এসব কোম্পানির মালিক বানানো হয়েছিল প্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের। কি কারবার! ফলে যা হওয়ার তাই হলো। এসব ঋণের বড় অংশ এখন খেলাপি। আর এই ঋণের কারণে জনতা ব্যাংক এখন ঋণখেলাপিতে শীর্ষে।

শুধু সরকারি ব্যাংক নয়, বেসরকারি খাতের ব্যাংক ইউনিয়ন ব্যাংকে ভল্ট কেলেঙ্কারির ঋণেও বড় অনিয়ম ধরা পড়ে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক পরিদর্শনে দেখতে পায় যে, শুধু ট্রেড লাইসেন্সের ভিত্তিতে কোম্পানি খুলে ঋণের বড় অংশই নিয়ে নিয়েছে প্রায় ৩০০ প্রতিষ্ঠান। তাজ্জবের ব্যাপার হলো, অনেক ক্ষেত্রে এসব প্রতিষ্ঠানের কোনো ট্রেড লাইসেন্সও ছিল না। কাগুজে এসব কোম্পানিকে দেওয়া ঋণের বেশির ভাগেরই খোঁজ মিলছে না এখন। ঋণ গ্রহীতা নেই, ফলে এসব ঋণ আদায়ও হচ্ছে না।

ইউনিয়ন ব্যাংকের বিতরণ করা ঋণের ১৮ হাজার ৩৪৬ কোটি টাকা খেলাপি হওয়ার যোগ্য বলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রতিবেদনে উঠে এসেছিল, যা ছিল ব্যাংকটির মোট ঋণের ৯৫ শতাংশ। একইভাবে সোশ্যাল ইসলামি ব্যাংকেও বড় অনিয়ম পেয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। তবে ব্যাংক দুটি এখনো এসব ঋণখেলাপি বলে ঘোষণা করেনি। ঋণ পরিশোধের মেয়াদ বাড়িয়ে ও পুনঃতফসিল করে ঋণগুলো নিয়মিত দেখাচ্ছে ব্যাংক দুটি। তাতে ব্যাংকের ইমেজ ও আমানত কোনোটাই কি রক্ষা পাবে?

একই ধরনের ঘটনা ধরা পড়ল এবার ইসলামি ব্যাংকে। ব্যাংক থেকে যেসব প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দেওয়া হয়েছে, তার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। তবে ঘটনাটা এক দিনে ঘটেনি। এমন ঋণ দেওয়া শুরু করেছিল চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জ শাখা থেকে। দেখা গেছে, ব্যাংকটির যেসব কর্মকর্তা এই ঋণ প্রদানে সহায়তা করেছেন, তাদের দ্রুত পদোন্নতি হয়েছে। এবং তাদেরই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ঋণ-সংক্রান্ত বিভাগগুলোতে। ফলে সহজেই বণ্টন করা হয়েছে ভুয়া ঋণ। এসব ঋণের মেয়াদ দেওয়া হয়েছে বেশি, যাতে সহজেই ঋণখেলাপি না হয়। ভুয়া কোম্পানি খুলে শুধু ঋণ দেওয়া নেওয়া নয়, দেশের কয়েকটি ব্যাংক দখলের সময়ও এমন কিছু কোম্পানির নাম ব্যবহার হয়েছিল, যাদের সঠিক পরিচয় ছিল না।

বাংলাদেশ ব্যাংক যদি উদাসীন বা নিষ্ক্রিয় থাকে, তখন ভালো ব্যাংকগুলো, যাদের আমানত বেশি সেগুলো আক্রান্ত হবে এবং এটাই ঘটছে। পত্রপত্রিকায় নাম আসছে যে, একজন ব্যক্তি ও তার পরিবার ব্যাংক খাতকে বড় ঝুঁকিতে ফেলে দিচ্ছে। এটা যে অর্থনীতির জন্য কত বড় বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে সরকার কি তা বুঝে না? তাহলে কেন চুপ করে ছিল, প্রতিকারের কোনো লক্ষণ দেখা গেল না কেন? নিয়ন্ত্রক সংস্থা ও দুর্নীতি দমন সংস্থা আর কত দিন চোখ বন্ধ রাখবে বা দেখতে চাইবে না? রেমিট্যান্সের মাধ্যমে যে ডলার আয় হয়, তা ব্যাংক মালিকদের কোম্পানির আমদানিতে খরচ করতেই যদি শেষ হয়ে যায়, অন্য কেউ যদি ব্যবসা করার সুযোগ না পায় তাহলে কী অবস্থা দাঁড়াবে? পুরো ভোগ্যপণ্যের বাজার যদি এসব প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণে চলে যায় তাহলে দেশটা জিম্মি হয়ে পড়বে এদের হাতে। যার বিষময় ফল এরই মধ্যে হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন দেশবাসী।

ব্যাংক থেকে টাকা নেওয়ার এবারের ঘটনাটা অনেক বড়। ইসলামি ব্যাংক থেকে এস আলমের ৩০ হাজার কোটি টাকার অধিক লোপাটের এই চাঞ্চল্যকর ঘটনার পরও এটা মনে করা স্বাভাবিক যে এই ধরনের ঘটনা এটাই প্রথম নয়। এবং আতঙ্কের সঙ্গে ভাবতে হবে এটাই শেষ নয়। সেই গল্পটা তো মনে আছে।

কুমির তার বাচ্চাদের লেখাপড়া শেখাতে দিয়েছিল শিয়ালের কাছে। শিয়াল-কুমিরের ছানাগুলোকে খেয়ে ফেলেছিল। প্রতিশোধের আশায় ক্রুদ্ধ কুমির এক দিন ধরে ফেলেছিল শিয়ালকে। শিয়ালের পা ধরে টেনে নেওয়ার সময় ধূর্ত শেয়াল চিৎকার করে ওঠে ওরে আমার লাঠি ছাড়, তুই তো আমার লাঠি ধরেছিস। সরল কুমির ভাবে, সে হয়তো শিয়ালের পায়ের বদলে লাঠি ধরেছে। তাই দ্রুত পা ছেড়ে দিয়ে পা মনে করে লাঠিটাকেই ধরে ফেলে। আর এই সুযোগে লাঠি ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে যায় ধূর্ত শেয়াল। এখন শুধু শিয়াল কুমিরের যুগ নয়। এখানে আছে ক্ষমতার ছায়া আর সহায়তা। কুমিরের বাচ্চার মতো জনগণের আমানত থাকে ব্যাংকে। সেখানে আছে ধূর্ত শিয়াল। এরা প্রত্যক্ষ পরোক্ষ সহায়তা পেয়ে খেয়ে ফেলছে আমানতের টাকা। এস আলম কী শিয়ালের পা না লাঠি এই সন্দেহ যেমন আছে তেমনি লুটপাট যে হচ্ছে তার সত্যতাও আছে।

ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকার জনগণের জন্য কত ভর্তুকি দিচ্ছে আর সে ভর্তুকি দিতে প্রধানমন্ত্রীর কত কষ্ট! সেইসব কথা প্রচার মাধ্যমগুলোয় ফলাও করে প্রচার করা হচ্ছে। জনগণ দেখছে—জনগণের ট্যাক্সের টাকা দিয়ে দ্রব্যমূল্যের অসহ্য চাপে পিষ্ট শ্রমজীবী মানুষের জন্য খাদ্য সহায়তা বাড়ানোর টাকা বরাদ্দ করতে কত কসরত করতে হয় আর ব্যাংকে রাখা আমানত থেকে হারিয়ে যায় হাজার হাজার কোটি টাকা!

এই লুটপাটের দায় কে বহন করবে? দায় তো বহন করবে সেই দুর্ভাগা জনগণ যাদের সংসার চালানো এখন কঠিন হয়ে পড়েছে। ব্যাংকে টাকা রাখে সাধারণ মানুষ, সরকারের স্নেহ, সহায়তা পুষ্ট অসাধারণরা টাকা পাচার করে। আবার এরাই ব্যাংকের মালিক হয়, নীতিনির্ধারক হয়। এই দুর্বৃত্ত পোষণের রাজনীতির অবসান হবে কবে? সারা পৃথিবীর দৃষ্টান্ত এই যে, পুঁজিবাদী শোষণ রহাল রেখে এই দুনীতি আর লুটপাটের অবসান হবে না। এর জন্য প্রচলিত ব্যবস্থা বদল করতে হবে। জনগণের সম্পদের পাহারাদার জনগণকেই হতে হবে।

তাজরিন হত্যাকাণ্ডের দায়িদের শাস্তি নিশ্চিত কর

সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট

২০১২ সালে ২৪ নভেম্বর সাভার আশুলিয়ায় তাজরীন ফ্যাশনসে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় নিহত ১১১ জন পোশাকশ্রমিকের স্মরণে সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট, গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্ট ও রিকশা, ব্যাটারি রিকশা ও ইজিবাইক চালক সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে অগ্নিকাণ্ডের দশ বছর পূর্তিতে জুরাইন কবরস্থানে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ ও মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়। মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন শ্রমিক ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির কোষাধ্যক্ষ জুলফিকার আলী, প্রচার ও প্রকাশনাবিষয়ক সম্পাদক আবু নাঈম খান বিপ্লব, সদস্য আফজাল হোসেন, এস এম কাদির, গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় কমিটি সাধারণ সম্পাদক সেলিম মাহমুদ, সাইফুল ইসলাম শরিফ, রুহুল আমিন সোহাগ ও দাউদ আলী মামুন।

নেতৃবৃন্দ বলেন, তাজরিন ফ্যাশনসের মালিক কর্মস্থলে শ্রমিকের নিরাপত্তার ব্যবস্থা রাখেনি। উপরন্তু কারখানার গেইটে তালা দিয়ে বন্ধ করে রাখার কারণে আগুণ লাগার পর শ্রমিকরা বের হতে পারেনি। তাই ১১১ জন পোশাকশ্রমিকের মৃত্যু ও অসংখ্য শ্রমিক আহত হয়েছে। এটা কোন দুর্ঘটনা নয়, হত্যাকাণ্ড। এর জন্য মালিক কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা দায়ী। তাই তাদের বিচার ও সাজা হওয়া দরকার। দুর্ঘটনার এক বছর পরে সিআইডি তাজরীনের এমডি দেলোয়ার হোসেন, তাঁর স্ত্রী মাহমুদা আক্তার, প্রকৌশলী এম মাহবুবুল মোর্শেদ, প্রশাসনিক কর্মকর্তা দুলাল, স্টোর ইনচার্জ হামিদুল ইসলামসহ ১৩ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল করে। এরা ক্ষমতাসীনদের সাথে যুক্ত হয়ে প্রভাব খাঁটিয়ে বিচার কার্যক্রমকে ব্যহত করে। বর্তমানে আসামিরা সবাই জামিনে আছে। শুধু তাই নয় প্রধান আসামি দেলোয়ারকে ক্ষমতাসীন দল '২২ সালে ঢাকা মহানগর উত্তর মৎস্যজীবী লীগের সভাপতি বানিয়েছে। এতে প্রমাণ হয় এরা ক্ষমতাসীনদের কতটা আশ্রয়-প্রশ্রয় নিয়ে নিরাপদ জীবনযাপন করছে।

নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে এ হত্যাকাণ্ডের আসামিদের বিচার ও দৃষ্টান্তমূলক সাজা দাবি করেন।

সাহেবগঞ্জ ইক্ষু খামারের জমি প্রকৃত মালিকদের বুঝিয়ে দাও

সাঁওতাল পল্লিতে অগ্নিসংযোগ ও হত্যার বিচার চাই

আদিবাসীদের নামে দায়েরকৃত হয়রানিমূলক মামলা প্রত্যাহার কর

বাপ-দাদার জমি ফেরত, ২০১৬ সালে ৬ নভেম্বর সাঁওতাল পল্লিতে হামলা চালিয়ে তিনজন সাঁওতালকে হত্যা মামলার চার্জশিট প্রদান, আদিবাসী-বাঙালিদের নামে দায়েরকৃত মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার এবং বাগদা ফার্মে ইপিজেড বন্ধসহ ৭ দফা দাবিতে ১ ডিসেম্বর বাগদা ফার্মের মাতারবাড়ি থেকে গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা চত্বর পর্যন্ত ৯ কি.মি রাস্তায় বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ঢাকা-রংপুর মহা সড়কের চারমাথায় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সাহেব গঞ্জ বাগদা ফার্ম ভূমি উদ্ধার সংগ্রাম কমিটির সভাপতি বার্নাবাস টুডুর সভপাতিত্বে সমাবেশে সংহতি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন বাসদ গাইবান্ধা জেলা শাখার আহবায়ক গোলাম রব্বানী, ভূমি উদ্ধার সংগ্রাম কমিটির সাধারণ সম্পাদক জাফরুল ইসলাম প্রধান, তাজুল ইসলাম, রাফায়েল হাসদা, সামিউল আলম রাসু, আতাউর রহমান সবুর, গণেশ মুর্মু প্রমুখ।

নেতৃবৃন্দ বলেন, ঘটনার পর ছয় বছর অতিবাহিত হলেও পুলিশ প্রশাসন সাঁওতাল হত্যা মামলার চার্জশিট দেয়নি। উল্টো আদিবাসীদের নানা অজুহাতে হয়রানি করছে।

নেতৃবৃন্দ বাগদা ফার্মে তিন ফসলি কৃষি জমিতে ইপিজেড বন্ধসহ সাত দফা দাবি মেনে নেয়ার জন্য সরকারের নিকট জোর দাবি জানান।

জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ : পর্যাবেক্ষণ, প্রশ্ন ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ' শীর্ষক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত

বিজ্ঞান আন্দোলন মঞ্চ খুলনা জেলা শাখা

বিজ্ঞান আন্দোলন মঞ্চ খুলনা জেলা শাখার উদ্যোগে ২ ডিসেম্বর নগরীর বিএমএ অডিটরিয়ামে 'জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ : পর্যাবেক্ষণ, প্রশ্ন ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ' শীর্ষক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের খুলনা জেলার সভাপতি নভোজ্যোতি সরকারের সভাপতিত্বে এবং বিএল কলেজ শাখার সদস্য হাফসা মাহবুব নিপুণ ও সাজ্জাদুল ইসলাম তানভীরের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আলোচনা করেন বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশন (বিএমএ), খুলনা জেলা সভাপতি ডা. শেখ বাহারুল আলম, সরকারি ব্রজলাল (বিএল) কলেজের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক প্রীতিষ কুমার রায়, সহকারি অধ্যাপক প্রদীপ কুমার সমাদ্দার, সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলের সহকারি শিক্ষক প্রজ্ঞা রায়, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক শোভন রহমান, বিজ্ঞান আন্দোলন মঞ্চ খুলনা জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক কাজী রুবায়েত ইসলাম প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে আলোচকবৃন্দ বলেন, সমাজে কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা দূর করতে এবং বিজ্ঞান চেতনা বিকাশে বিজ্ঞান আন্দোলন মঞ্চের মতো বিজ্ঞান সংগঠনকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।

আলোচকবৃন্দ আরও বলেন, জেসম ওয়েব টেলিস্কোপ ও মহাবিশ্ব নিয়ে আলোচনা বিজ্ঞানভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি সকল ধরনের পূর্বনির্ধারিত বিশ্বাস এড়িয়ে ইহজাগতিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে ভূমিকা রাখবে। ২০২২ সালের পদার্থবিজ্ঞানের নোবেল বিজয়ী ৩ বিজ্ঞানীর কোয়ান্টাম এন্টেঙ্গলম্যান্ট বিষয়ে আলোচনায় ছাত্রদের বস্তু জগতের নিয়ম জানার ক্ষেত্রে আধুনিক গবেষণার প্রতি অনুসন্ধিৎসু মনন তৈরি করবে।

আলোচকবৃন্দ বলেন, আজকের শিক্ষাব্যবস্থায় বিজ্ঞান শিক্ষা উপেক্ষিত। ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতা গড়ে ওঠার পরিবর্তে শুধুমাত্র কারিগরি দক্ষতা তৈরি হচ্ছে। তাই বিজ্ঞান আন্দোলন মঞ্চকে যথাযথ বিজ্ঞান শিক্ষার লক্ষ্যে শিক্ষাব্যবস্থা পরিবর্তনের দাবিতে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। অনুষ্ঠান শেষে সংগঠনের পক্ষ থেকে জাতিসংঘ পার্কে টেলিস্কোপের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের চাঁদ পর্যবেক্ষণ করানো হয়।

শোক সংবাদ

বিচারপতি গোলাম রাব্বানী

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ ১৪ নভেম্বর '২২ সংবাদপত্রে দেয়া এক বিবৃতিতে বিচারপতি গোলাম রাব্বানীর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন।

বিবৃতিতে কমরেড ফিরোজ বলেন, বিচারপতি গোলাম রাব্বানী জীবন জীবিকার সংগ্রামে নিজেকে যুক্ত রেখেও জাতীয় সম্পদ রক্ষার আন্দোলনে সংগঠকের ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি গ্যাস রপ্তানির বিরুদ্ধেও সোচ্চার ছিলেন। তাঁর এই অবদান জাতি কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করবে।

শহিদ নূর হোসেনের প্রতি বাসদের শ্রদ্ধা

১০ নভেম্বর '২২ শহিদ নূর হোসেনের স্মৃতির প্রতি বাসদের শ্রদ্ধা নিবেদন

ব্যাটারিচালিত যানবাহনের লাইসেন্স প্রদানের দাবি ও হয়রানি বন্ধের আন্দোলন তীব্র হচ্ছে

শেষ পৃষ্ঠার পর

বিভিন্ন জেলায় ও বিভাগীয় শহরে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা ও সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি কমরেড রাজেকুজ্জামান রতন, সংগঠনের কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক খালেকুজ্জামান লিপন, সদস্যসচিব প্রকৌশলী ইমরান হাবিব রুমন, সদস্য জনার্দন দত্ত নান্টু, সাইফুজ্জামান টুটুল, আবু নাঈম খান বিপ্লব, মেহেদী হাসান, শ্যামল বর্মন, মালেক মনছুর, আশরাফুজ্জামান আশরাফ, অর্জুন দাস, অ্যাড. মিলন মন্ডল, আবু জাফর, কহিনুর আক্তার কনা।

বিভাগীয় ও জেলা নেতৃবৃন্দের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, সুনামগঞ্জ জেলার সোহেল আহমদ, হবিগঞ্জ জেলার দিলাল মিয়া, সেলিম আহমদ, মৌলভীবাজার জেলার রুস্তম মিয়া, আলী হোসেন, সিলেট জেলা ও মহানগরের বেলাল আহমদ, শুক্কুর আহমদ, ইয়াছিন আলী, রফিক আহমদ, সাহেদ আহমদ, আব্দুল মালেক, আব্দুস শহিদ, সেলিম আহমদ, মিন্টু যাদব, নুরুল, শরিফুল, মনজুর আহমদ, কাওছার আহমদ প্রমুখ।

জনসভা ও সমাবেশগুলিতে নেতৃবৃন্দ বলেন, নানা বাধা, ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের বিরুদ্ধে জীবন ও জীবিকা রক্ষার আন্দোলন করছে চালকরা। এক দিনে আন্দোলন অন্যদিকে আইনি লড়াই দুটোর ফলে হাইকোর্টের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে মহাসড়ক ব্যতীত সর্বত্র ইজিবাইকসহ ব্যাটারিচালিত যানবাহন চলাচলের আদেশ প্রদান করেছে মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, সংগ্রাম পরিষদ গত ১০ বছর যাবৎ নকশা আধুনিকায়ন ও নীতিমালা প্রণয়ন করে ব্যাটারিচালিত যানবাহনের লাইসেন্স প্রদানসহ ৬ দফা দাবিতে আন্দোলন পরিচালনা করে আসছে। হাইকোর্টের আদেশ বাতিল হওয়ায় ইজিবাইকসহ ব্যাটারিচালিত যানবাহন চলাচলের জন্য সরকার প্রস্তাবিত খসড়া 'থ্রি-হুইলার ও সমজাতীয় মোটরযানের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা ২০২১'-এর দ্রুত চূড়ান্ত ও কার্যকর করতে আর কোনও আইনগত বাধা নেই।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, ঢাকাসহ সারাদেশে অবৈধ কার্ড ব্যবসায়ী ও অসাধু পুলিশ মিলে সুপ্রিম কোর্টের আদেশ আসার পর মহাসড়কের বিভ্রান্তমূলক ব্যাখ্যা ও বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের নামে বিভিন্ন সড়কে ও অলিগলি থেকে ইজিবাইক, রিকশাসহ ব্যাটারিচালিত যানবাহন আটক, ডাম্পিং, রেকারিং-এর নামে চালক-মালিকদের কাছ থকে অবৈধভাবে অর্থ আদায়সহ নানা হয়রানি করেছে।

সুপ্রিম কোর্ট মহাসড়ক ব্যতীত সর্বত্র ইজিবাইকসহ ব্যাটারিচালিত যানবাহন চলাচলের আদেশ প্রদান করেছেন। কিন্তু সড়কে শৃঙ্খলা ফেরাতে ও দুর্ঘটনা কমাতে অনেক কিছু করণীয় আছে। প্রতিটি সড়ক-মহাসড়কে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা ও দুর্ঘটনা কমাতে হলে সড়ক-মহাসড়কের কাঠামোগত পরিবর্তন ও নিরাপদ ট্রাফিক ব্যবস্থা সর্ম্পকে জনসচেতনতা গড়ে তুলতে হবে। মহাসড়ক তাকেই বলে, যে সড়কে বাস-ট্রাক-প্রাইভেট গাড়ি বাধাহীনভাবে চলবে। পার্শ্ব রাস্তা থেকে পথচারিসহ কোনও লোকাল যানবাহন সেখানে ঢোকার সুযোগ থাকবে না। এটা অনেকটা সংরক্ষিত অঞ্চলের মতো হবে। কিন্তু আমাদের দেশে এ ধরনের সড়ক আগে খুব বেশি নির্মাণ করা হয় নাই। কিন্তু আমাদের দেশের বাস্তবতা ভিন্ন। জনবহুল আমাদের দেশে এ ধরনের কোন সড়ক বা মহাসড়ক নেই। দেশের বেশিরভাগ সড়ক-মহাসড়কসমূহ জেলা-উপজেলা সদরসহ বাজারের পাশ দিয়ে বা উপর দিয়ে গিয়েছে। ফলে, গণপরিবহন না থাকায় ইজিবাইক, রিকশাসহ ব্যাটারিচালিত যানবাহন ছাড়া এ সমস্ত স্থানে আসা-যাওয়া যাত্রীদের চলাচল করা অত্যন্ত কঠিন।

মহাসড়কে ইজিবাইকসহ স্বল্প গতির ও লোকাল যানবাহন চলাচলের জন্য পৃথক লেন বা সার্ভিস রোড নির্মাণ না করলে সড়ক-মহাসড়কে সার্বিক শৃঙ্খলা ও যানজট নিরসন করা যাবে না। এ সমস্যা সমাধানের প্রস্তাব সংগ্রাম পরিষদ ৬ দফার মাধ্যমে সরকারের কাছে পেশ করেছে। ইতিমধ্যে ঢাকা-ভাঙ্গা, আশুলিয়া-এলেংগা ও হটিকমরুল-বনপাড়া মহাসড়কে পৃথক লেন বা সার্ভিস রোড নির্মাণ করা হয়েছে।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, ব্যাটারি রিকশা ও ইজিবাইকের বিরুদ্ধে বিদ্যুৎ অপচয়ের বা বেশি বিদ্যুৎ ব্যবহারের অভিযোগ আনা হয়, যা সঠিক নয়। এ বিষয়ে একটু পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, একটি ব্যাটারিচালিত রিকশা-ভ্যান একবার ৮ ঘণ্টা চার্জ দিতে ৩.৫/৪ ইউনিট এবং একটি ইজিবাইকের চার্জ দিতে প্রায় ৫ ইউনিট বিদ্যুৎ প্রয়োজন হয়। আর একটি ২ টনের এসি ৮ ঘণ্টা চলতে ১৯ ইউনিট বিদ্যুৎ প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ ২ টনের একটি এসি ১ ঘণ্টা চলতে ২.৪ ইউনিট বিদ্যুৎ প্রয়োজন হয়। তাহলে কোনটা অপচয়? ১ ঘণ্টা এসিতে ঠান্ডা বাতাসে গা জুড়ানো না ৫/৬ জনের একটি পরিবারের জীবন-জীবিকা রক্ষা। ব্যাটারিচালিত যানবাহনের চালকরা বিদ্যুৎ চুরি করে না বরং বেশি দাম দিয়েই বিদ্যুৎ ব্যবহার করে। বিদ্যুৎ বিভাগের এক হিসেবে দেখা যায় সারাদেশের সব ব্যাটারি রিকশা ও ইজিবাইক মিলে মাত্র ২৫০/৩০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ ব্যবহার করে। যার দাম তারা বাণিজ্যিক মূল্যেরও অধিক হারে পরিশোধ করে। এখন দেশে উৎপাদিত মোট বিদ্যুতের ৩৭ ভাগ অব্যবহৃত থাকছে বা অলস পড়ে আছে। এরজন্য সরকারকে প্রতি মাসে হাজার হাজার কোটি টাকা বিভিন্ন প্রাইভেট বিদ্যুৎ কোম্পানিকে বসিয়ে বসিয়ে দিতে হচ্ছে। তাহলে বিদ্যুৎ অপচয় ও চুরির কথা কতটা যৌক্তিক।

নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে হয়রানি বন্ধ করে ৫০ লাখ চালক, মালিক, মেকানিক, গ্যারেজ মালিক ও তাদের উপর নির্ভরশীল প্রায় তিন কোটি মানুষের জীবন-জীবিকা রক্ষায় সংগ্রাম পরিষদের সংশোধন প্রস্তাব গ্রহণ করে 'থ্রি-হুইলার ও সমজাতীয় মোটরযানের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা-২০২১-এর আলোকে ব্যাটারিচালিত ইজিবাইক ও রিকশার দ্রুত নিবন্ধন, রুট পারমিট এবং লাইসেন্স প্রদান, মহাসড়কের বিভ্রান্তিমূলক ব্যাখ্যা এবং বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের নামে বিভিন্ন সড়কে চলাচলে হয়রানি বন্ধ করাসহ ৬ দফা দাবি আদায়ে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। সংগ্রাম পরিষদ ইতিমধ্যে ৬ দফা দাবিতে আন্দোলন গড়ে তুলছে। সারাদেশের গাড়ির মালিক ও চালকদের তালিকা করে তাদের নিবন্ধন ও লাইসেন্স প্রদানের দাবিতে আগামী জানুয়ারি মাসে ঢাকায় সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রণালয়ে এবং বিআরটিএ বরাবর স্মারকলিপি প্রদানের কর্মসূচি ও মার্চ মাসে ঢাকায় মহাসমাবেশ সফল করার জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানান।

বেগম রোকেয়ার জীবন-সংগ্রাম : অন্ধকার সময়ে মুক্তির পথ দেখাবে

শেষ পৃষ্ঠার পর

সমাবেশের আয়োজন করা হয়। সমাবেশ শেষে মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া সকাল ৯.৩০টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হলে রোকেয়া ভাস্কর্যে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

নারী সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরামের কেন্দ্রীয় সভাপতি প্রকৌশলী শম্পা বসু। সমাবেশে আলোচনা করেন বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ, সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরামের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা রওশন আর রুশো, কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ডা. মনীষা চক্রবর্ত্তী। সমাবেশ পরিচালনা করেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক রুখশানা আফরোজ আশা।

সমাবেশে কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ বলেন, 'বেগম রোকেয়া যে সময় জন্মগ্রহণ করেছিলেন সে সময় সমাজ ব্যবস্থা অশিক্ষার অভিশাপ ও পুরুষতন্ত্রের অবরোধ প্রথার মধ্যে ডুবে ছিল। সে সময় মেয়েদের লেখাপড়া ছিল সামাজিকভাবে নিষিদ্ধ ও পাপতুল্য। ভাই ও বোনের কাছে রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে বাংলা ইংরেজি পড়তে শিখেছিলেন তিনি। অবরোধ প্রথার যন্ত্রণা ও গ্লানি অনুভব করেছিলেন নিজের জীবনে। মাত্র ১৬ বছর বয়সে বিয়ে ও ২৯ বছর বয়সে বিধবা হয়ে তিনি বুঝেছিলেন সমাজে নারীর অবস্থা কতটা নিগৃহীত। এ অবস্থা থেকে নারীর মুক্তি ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার হিসেবে নারী শিক্ষার জন্য লড়াই শুরু করেছিলেন। কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সার্বিকভাবে সমাজের অগ্রগতি। কারণ তিনি বুঝেছিলেন অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারীকে পেছনে ফেলে রেখে সমাজের অগ্রগতি সম্ভব নয়। তাঁর সেই লড়াই আজও আমাদের প্রেরণা যোগায়। বেগম রোকেয়ার মৃত্যুর ৯০ বছর পর এবং স্বাধীনতার ৫১ বছর পরেও বাংলাদেশের আইনেই নারীর প্রতি বৈষম্য রাখা হয়েছে। পারিবারিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিনিয়ত সেই বৈষম্যমূলক আচরণ নারীদের অগ্রযাত্রাকে ব্যহত করছে।'

সমাবেশে অন্যান্য নেতৃবৃন্দ বলেন, 'বাহ্যিকভাবে দেখলে দেখা যাবে দেশে নারী প্রধানমন্ত্রীসহ অনেক বড় বড় দায়িত্ব পালন করছে। কিন্তু সমাজ মননে আরও বেশি অবক্ষয় ঘটে যাচ্ছে। সারাদেশে নারী-শিশু ধর্ষণ-নির্যাতন-হত্যা এক ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। ঘরে-বাইরে সর্বত্র যেকোন স্থানে, দিনে রাতে যেকোন সময়ে একজন নারী নির্যাতনের শিকার হতে পারেন। বেশিরভাগ ঘটনার ক্ষেত্রেই দ্রুত এবং উল্লেখযোগ্য বিচারের নজির দেখা যায় না। আবার পারিবারিক জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে নারী বৈষম্যের শিকার। সম্পত্তির উত্তরাধিকার, বিবাহ-বিবাহ বিচ্ছেদ, সন্তানের অভিভাবকত্বসহ সকল ক্ষেত্রে নারীর প্রতি বৈষম্য বিরাজমান। নারীর গৃহস্থালি কাজ ছাড়া পরিবার চলে না কিন্তু গৃহস্থালি কাজের কোন স্বীকৃতি পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে নাই। সমকাজে সমমজুরী আইনে থাকলেও বাস্তবে প্রায় সমস্ত অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নারী পুরুষের তুলনায় কম মজুরী পেয়ে থাকেন। শ্রমজীবি নারীদের জন্য নিরাপদ কর্মপরিবেশ, পর্যাপ্ত মজুরী, সবেতন মাতৃত্বকালীন ছুটি, ডে কেয়ার সেন্টারসহ প্রয়োজনীয় ন্যুনতম আয়োজন নেই। নারীর সস্তা শ্রমকে ব্যবহার করে মুনাফা করতে মালিক শ্রেণি যত আগ্রহী, তাদের কাছে ততটাই উপেক্ষিত নারীর অধিকার।'

নেতৃবৃন্দ আরো বলেন, 'নারীকে মানুষ হিসেবে মর্যাদা দেয়ার দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলার লক্ষ্যে রাষ্ট্রের উদ্যোগ খুবই অপ্রতুল। বিজ্ঞাপন, সিনেমায় নারীকে পণ্য হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। ওয়াজ মাহফিলে নারীকে নিয়ে অশ্লীল-কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য দেয়া হয়। নারীর এসকল সংকটের মূলে রয়েছে পুরুষতান্ত্রিকতা ও পুঁজিবাদী শোষণমূলক ব্যবস্থা।

সমাজের সকল বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে, শোষণমূলক সমাজ ও পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা পরিবর্তনে বেগম রোকেয়া আজও প্রেরণার উৎস। নারী পুরুষের মিলিত সংগ্রামে সাম্য সমাজ প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে বেগম রোকেয়ার জীবন সংগ্রাম আজও পাথেয়।' নেতৃবৃন্দ বেগম রোকেয়ার জীবন সংগ্রাম থেকে শিক্ষা নিয়ে বর্তমানের অন্ধকার সময়ে নারী-পুরুষ মিলিতভাবে নারী মুক্তি তথা সমাজের সার্বিক মুক্তির সংগ্রাম জোরদার করার আহ্বান জানান।

এছাড়া সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরাম বরিশাল, ঝিনাইদহ, গাইবান্ধা, জয়পুরহাট, সিলেট, কিশোরগঞ্জ, চাঁদপুর, খুলনা, নওগাঁ, সিরাজগঞ্জ ও বগুড়া জেলা শাখার উদ্যোগে রোকেয়া দিবস উপলক্ষে নানা কর্মসূচি পালিত।

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট : সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় শাখার উদ্যোগে ৩ ডিসেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাফেটেরিয়ার হল রুমে রোকেয়ার জীবন সংগ্রাম ও আজকের বাস্তবতা প্রসঙ্গে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সহকারী সাধারণ সম্পাদক কমরেড রাজেকুজ্জামান রতন, সম্পাদক কমরেড আব্দুল কুদ্দুস, বেরোবি'র ইংরেজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক আলী রায়হান সরকার, ছাত্র নেতা যুগেশ ত্রিপুরা, ও রিনা মুর্মু।

সরকারি আজিজুল হক কলেজের শিক্ষার্থীদের পরিবহন সেবা যথাযথভাবে নিশ্চিত করার দাবি

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট কলেজ সরকারি আজিজুল হক কলেজে শাখার উদ্যোগে কলেজের পরিবহন সংকট নিরসনে দাবিতে ১৪ ডিসেম্বর অধ্যক্ষ বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

স্মারকলিপি প্রদান করেন ছাত্র ফ্রন্ট বগুড়া জেলা শাখার সভাপতি ধনঞ্জয় বর্মন, কলেজ শাখার সংগঠক চয়ন কুমার, লক্ষণ কুমার, রিফাত ইসলাম, মিষ্টি রানী প্রমুখ।

নেতৃবৃন্দ বলেন, শিক্ষা ব্যয়ের লাগামহীন ঊর্দ্ধগতি ছাত্র সমাজ ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলছে। শিক্ষা অধিকার থেকে মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানেরা বঞ্চিত হয়ে পড়ছে। কারণ, শিক্ষায় চলছে বাণিজ্যিকীকরণের ধারা। শিক্ষাকে এখন অধিকারের পরিবর্তে মুনাফা লাভের ক্ষেত্র হিসেবে দেখা হচ্ছে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, আজিজুল হক কলেজে গাড়ি আছে মাত্র ৭টি, যা শিক্ষার্থী তুলনায় খুবই অপ্রতুল।

সাম্প্রতিক সময়ে এই গাড়িগুলোও শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন উপজেলা থেকে শুধু নিয়ে আসে কিন্তু দিয়ে আসে না। এতে শিক্ষার্থীদের বাড়তি টাকা খরচ বাড়ি ফিরে যেতে হয়। যাওয়ার খরচ জোগাতে পারে না বলে ক্লাসে শিক্ষার্থীর উপস্থিতি কমে যাচ্ছে এবং শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রহণের কাজও ব্যাহত হচ্ছে। এমনকি গাড়ি ছাড়ার সময়ও কোনো নোটিশ ছাড়া পরিবর্তন করা হচ্ছে। এতে শিক্ষার্থীরা পরিবহনসেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন স্বাভাবিক করতে নিম্নোক্ত দাবি তুলে ধরেন।

দাবি :

কলেজ গাড়িতে শিক্ষার্থীদের উপজেলায় নিয়ে আসা এবং দিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিয়ে এবং তা কার্যকর করে পরিবহন সেবা নিশ্চিত কর করতে হবে। গাড়ি ছাড়ার নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করতে হবে। শিক্ষার্থীদের চাহিদা অনুযায়ী কলেজ গাড়ির সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে।

MONTHLY VANGUARD
ভ্যানগার্ড

- বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর মুখপত্র
- ডিসেম্বর ২০২২; জানুয়ারি ২০২৩
- ২৩/২ তোপখানা রোড (তৃতীয় তলা), ঢাকা-১০০০। ফোন : ০২ ৪৭১২০২৩১
- Website : www.spb.org.bd

রুশ বিপ্লববার্ষিকী ও বাসদের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে

আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লববার্ষিকী ও বাসদের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে প্রবাসী বাসদ সমর্থক ফোরামের উদ্যোগে ২৭ নভেম্বর '২২ বাংলাদেশের সময় রাত ১০টায় অনলাইনে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ইটালি প্রবাসী নাজির মোহাম্মদ খান খসরুরর সভাপতিত্বে আমেরিকা প্রবাসী মামুনুর রশীদ সোহেলের পরিচালনায় বক্তব্য রাখেন বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির উপদেষ্টা কমরেড খালেকুজ্জামান, সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ, সহকারী সাধারণ সম্পাদক কমরেড রাজেকুজ্জামান রতন, আমেরিকা প্রবাসী আক্তার হোসেন অলক, জাফর আহম্মেদ, নিরঞ্জন পাল, সুইজারল্যান্ড থেকে নাসির উদ্দীন, ফ্রান্স থেকে মাসুক মিয়া মামুন, কানাডা থেকে আব্দুল ওয়াদুদ, কাজী আফজাল আহম্মেদ কপিল, মাহমুদুজ্জামান বাবু, থাইল্যান্ড থেকে শাহেন শাহ, মালয়েশিয়া থেকে আহম্মেদ আলী, ইংল্যান্ড থেকে আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ।

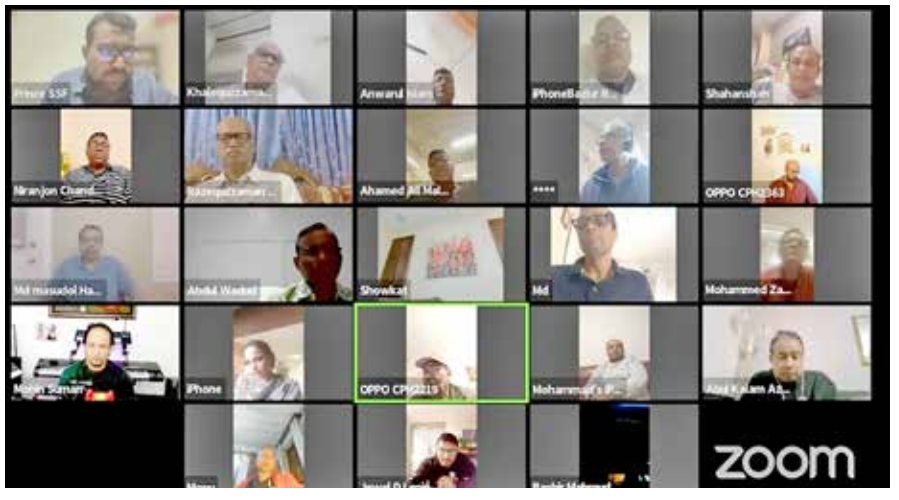

বেগম রোকেয়ার জীবন-সংগ্রাম ও শিক্ষা

গণতন্ত্রহীন, মর্যাদাহীন, অধিকারহীন অন্ধকার সময়ে মুক্তির পথ দেখাবে

রোকেয়া দিবস স্মরণে সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরামের সমাবেশ মিছিল অনুষ্ঠিত

৯ ডিসেম্বর নারীমুক্তি আন্দোলনের পথিকৃৎ বেগম রোকেয়ার ১৪২তম জন্ম ও ৯০তম মৃত্যুবার্ষিকী। সমাজে নারীকে মানুষ হিসেবে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা, নারীর সামনে সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করার সাহস, যুক্তি ও আপন প্রত্যয় নির্মাণের লক্ষ্যে আজীবন তিনি সংগ্রাম করেছেন। তিনি শুধু নারীদের নয়, সমগ্র সমাজের অগ্রগতির জন্য কাজ করেছেন। রোকেয়া দিবসের সমাবেশে কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ এ কথা বলেন। এই মহিয়সী নারীর জন্ম ও মৃত্যু দিবস স্মরণে সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরামের উদ্যোগে ৯ ডিসেম্বর '২২, শাহবাগ জাদুঘরের সামনে নারী

এরপর পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ১

ব্যাটারিচালিত যানবাহনের লাইসেন্স প্রদান ও হয়রানি বন্ধের দাবিতে আন্দোলন তীব্র হচ্ছে

- সংগ্রাম পরিষদের সংশোধনী প্রস্তাব গ্রহণ করে প্রস্তাবিত থ্রি হুইলার ও সমজাতীয় মোটরযানের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা ২০২১ দ্রুত চূড়ান্ত ও কার্যকর কর।
- নীতিমালার আলোকে ব্যাটারিচালিত রিকশা ইজিবাইক ও নিবন্ধন, রুট পারমিট এবং লাইসেন্স প্রদান কর।
- ইজিবাইক-রিকশাসহ ব্যাটারিচালিত যানবাহনের হয়রানি, অবৈধ রেকারিং, ডাম্পিং-নির্যাতন, ব্যাটারি ছিনতাই এবং চাঁদাবাজি বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ কর।
- প্রতিটি সড়ক-মহাসড়কে স্বল্প গতির যানবাহনের জন্য পৃথক লেন ও সার্ভিস রোড নির্মাণ কর।

বিভিন্ন জেলায় ও বিভাগীয় শহরে (অক্টোবর-ডিসেম্বর '২২) রিকশা, ব্যাটারিরিকশা-ভ্যান ও ইজিবাইক সংগ্রাম পরিষদের সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত।। **এরপর পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ১**

২৪ নভেম্বর সিলেট বিভাগীয় সমাবেশ শহরের রেজিস্ট্রারি মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখছেন সংগ্রাম পরিষদের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা ও সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের সভাপতি কমরেড রাজেকুজ্জামান রতন

অবিলম্বে বকেয়া মজুরি পরিশোধ করে পূর্ণাঙ্গ চুক্তি সম্পাদনের দাবি

বাংলাদেশ চা-শ্রমিক ফেডারেশন

১৩ নভেম্বর '২২ বাংলাদেশ চা-শ্রমিক ফেডারেশন কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে দিনব্যাপী প্রতিনিধিসভা মৌলভীবাজার পৌর জনমিলন কেন্দ্রে ফেডারেশনের সভাপতি বিপ্লব মাদ্রাজি পাশীর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক দীপংকর ঘোষের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড আহসান হাবিব বুলবুল। ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা অ্যাড. মঈনুর রহমান মগনু, আবু জাফর, অ্যাড. আবুল হাসান, প্রণবজ্যোতি পাল, ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহসভাপতি কাজল রায়, লিটন মৃধা, সাংগঠনিক সম্পাদক কিরণ শুক্ল বৈদ্য, অর্থ সম্পাদক প্রেম কুমার পাল, সদস্য দীপচান তেলী, রতন গড়াইত, কেশব তাঁতি, ভরত লাল, সবুজ গৌড়, ছাত্র ফ্রন্ট মৌলভীবাজার জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ নন্দী প্রমুখ।

নেতৃবৃন্দ চা-শ্রমিকদের প্রাপ্য বকেয়া মজুরি পরিশোধ করে পূর্ণাঙ্গ চুক্তি সম্পাদন করা এবং বাজার দরের সাথে সঙ্গতি রেখে ন্যায্য মজুরি বৃদ্ধির লড়াই জোরদারের দাবি জানান।

নেতৃবৃন্দ বলেন, চা-শ্রমিকরা ৩০০ টাকা মজুরির দাবিতে ১৯ দিন না খেয়ে লাগাতার আন্দোলন চালিয়েছে। প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা শ্রমিকদের সাথে মিটিং করে, ভয় দেখিয়ে এবং মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে নানা কায়দায় শ্রমিকদের আন্দোলন থেকে সরিয়ে নিয়ে মালিকদের স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা করেও শ্রমিকদের অনমনীয় দৃঢ়তার মুখে তাদের সকল অপচেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে পড়ে। ২৭ জুলাই প্রধানমন্ত্রী চা-বাগানের মালিকদের সাথে আলোচনা করে ১৭০ টাকা মজুরি নির্ধারণ করলেন। মজুরি নির্ধারণের সাড়ে তিন মাস চলে গেলেও মালিকরা নতুন মজুরি অনুযায়ী বকেয়া মজুরি পরিশোধ না করার জন্য নানা টালবাহানা করছে এবং সরকার বাগান মালিকদের স্বার্থ রক্ষা করে। নেতৃবৃন্দ দালাল নেতৃত্ব ত্যাগ করে আপসহীন বিপ্লবী ধারার ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে তোলার জন্য চা-শ্রমিকদের প্রতি আহ্বান জানান।

সংশোধন : ভ্যানগার্ড নভেম্বর ২০২২ সংখ্যায় 'শোষণ ও দুঃশাসন হটাতে চাই' শিরোনামের প্রবন্ধে কড়াইল বস্তিতে ৪০ হাজার দোকান লেখা হয়েছিল। প্রকৃত সংখ্যা হবে ১০ হাজার। ত্রুটির জন্য দুঃখিত। সম্পাদক।

সম্পাদক : রাজেকুজ্জামান রতন। বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ, কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে প্রকাশক : বজলুর রশীদ ফিরোজ কর্তৃক ২৩/২ তোপখানা রোড (তৃতীয় তলা), ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত।
সোনালী প্রিন্টিং প্রেস, ১৬৭ ইনার সার্কুলার রোড (ইডেন কমপ্লেক্স), মতিঝিল, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত। ফোন : ০২ ৪৭১২০২৩১, ফ্যাক্স : ০২ ৪৭১২০২৩১; E-mail : monthly.vanguard81@gmail.com